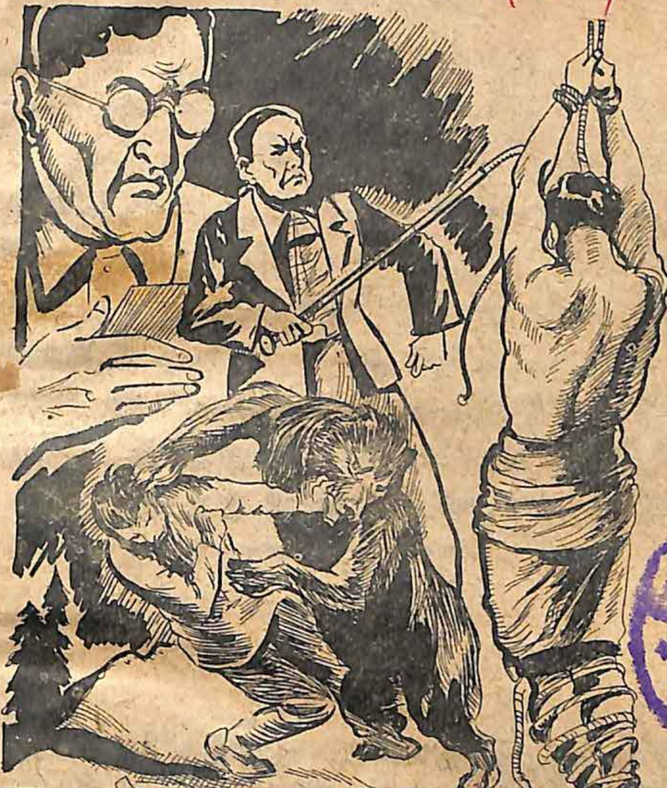
~~4034~~

2



বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি

শ্রীগদাধরচরণ নিয়োগী

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা ১২

প্রথম মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৩৫৭
দাম ঃ দেড় টাকা

কলিকাতা ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক বাণী-শ্রী প্রেস, ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড হইতে মুদ্রিত।



বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি

দুই বন্ধু কলেজের সিঁড়ি বেয়ে নামছিল। ডিগ্রির শেষে পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এখন তাঁদের অখণ্ড অবসর। অন্ততঃ পরীক্ষার ফলটা গেজেটে বের না হওয়া পর্য্যন্ত তো বটেই! পরীক্ষায় যে তারা শীর্ষস্থান অধিকার করবে এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না তাদের।

নিশীথ আর নিখিল। এই দুই বন্ধু এতদিন কলেজটাকে একটা হৈ চৈ এর মধ্যে মাতিয়ে রেখেছিল। কলেজের সব ছেলেই এদের ভালভাবে চিনতো, আর ভালবাসতো নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে। খেলাধূলা, লেখাপড়া, ডিবেটিং ক্লাব, ম্যাগাজিন সবগুলোতেই থাকতো এরা জড়িয়ে; এমন সুষ্ঠুভাবে এগুলো তারা সম্পাদন করে চলতো যে, সংলিষ্ট সবাই তাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে থাকতে পারতো না। নিশীথ যেবার হতো কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী, নিখিল হয়ে বসতো স্পোর্টস্‌এর ক্যাপ্টেন। পরের বছর আবার তারা বদলে নিতো পদ। কেউ সে বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলেই তার অবস্থা হাস্যকর হয়ে উঠতো; কারণ নিশীথ আর নিখিলই প্রতিবার প্রায় সব ক'টি ভোট পেত।

নিশীথ বিজ্ঞান আর নিখিল ছিল কলা বিভাগের ছাত্র। এই কলা আর বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ভাঙ্গন্ ছুটতো কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে। নিখিল কলিদাস, ভবভূতি, সেক্সপিয়র, মিণ্টন, বার্ণার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীদের সাহিত্য থেকে সারাংশ গ্রহণ করে বোঝাতে চেষ্টা করতো ঃ সাহিত্যই সত্য শিব আর সুন্দরের অভিব্যক্তি। সাহিত্যই প্রকৃতপক্ষে মূলাধার, সজীবতার সহায়ক। মানুষের মনে এ এনে দেয় সত্যিকার তৃপ্তির স্বর্গীয় আভাস। বিজ্ঞান মূক। মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রচেষ্টায় তাকে ভোগী করে তুলে ক্রমবর্দ্ধমান ভোগের আকাঙ্ক্ষায় তার দুর্ভোগের মাত্রাই বাড়িয়ে দেয়। তাই বিজ্ঞানের সাধনায় মানুষ হয়ে যায় কলের পুতুল, যন্ত্রেরই একটা অংশ বিশেষ। নিশীথ তখন আরম্ভ করতো আর্কি-মিডিস্, নিউটন, গ্যালিলিও, ষ্টিফেনশন্, স্যার জগদীশ ও আচার্য্য রায়ের আবিষ্কারের গুণকীর্ত্তন। মনের আবেগে সে বলে ফেলতো, বিজ্ঞানই মানুষের মুক্তি-সৌধ ; এবং এক-একটা আবিষ্কার এর সোপান শ্রেণী রচনা করে। এর বিস্ময়কর আবিষ্কারে মানুষ পায় চরম স্বাচ্ছন্দ্য-সমৃদ্ধি, মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচবার একটা উপায়। বিশ্ব সভ্যতা বিকাশের বাহন এই বিজ্ঞান। বিশ্বে এর দানের পরিমাণ অসীম। বিজ্ঞানের অভাবে মানুষকে বাস করতে হোতো আদিম মানুষের মতো গুহাবাসী হয়ে। আর সাহিত্য হচ্ছে কল্পনা-বিলাসী দুর্ব্বল

স্নায়ুতন্ত্রের দিবাস্বপ্ন। দুর্ব্বল মস্তিষ্কের জ্যোৎস্নামাখানো আকাশ-কুসুম রচনা মাত্র। বিজ্ঞানের দানের কাছে সাহিত্যের দানের তুলনাই হয় না।

নিখিল হেসে বলতো, এই যে কথার জাল বুনে চলেছো, এটাও সাহিত্যের কৃপায় এটা ভুললে চলবে না। সাহিত্য ছাড়া বিজ্ঞানের অস্তিত্বই টের পাওয়া যেত না—বিজ্ঞানের যা কিছু উন্নতি হয়েছে তা শুধু সাহিত্যের করুণা ধারায় পুষ্ট হয়েই হয়েছে।

নিশীথ প্রতিবাদ করে বলতো, ভুল বন্ধু ভুল, প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে যখন সাহিত্য ছিল অচল তখন বিজ্ঞান এনে দিয়েছে তার প্রাণশক্তি বজায় রাখার অপূর্ব্ব কৌশল। ভবিষ্যৎ-যুগে বিজ্ঞানই পরিচালিত করবে সাহিত্য। তখনকার সাহিত্য বৈজ্ঞানিকদের সাহিত্য। তোমাদের মতো কল্পনা-বিলাসীর স্থান থাকবে না সেখানে —

নিখিল বাধা দিয়ে বলতো. বিজ্ঞান এনে দিয়েছে প্রকৃতির রুদ্ররূপ। এর কল্যাণকামী আকাঙ্ক্ষা আজ ধ্বংসকারী প্রচেষ্টায় পরিণত হয়েছে। এর ধ্বংসোন্মুখী গতির মোড় ফেরাতে পারে একমাত্র সাহিত্য। অনাগত যে যুগ আমাদের সামনে আসছে, সাহিত্যের সৃজনী শক্তি বিজ্ঞানের বিকৃতরূপের পরিবর্ত্তন সাধন করে এক নবযুগ সৃষ্টি করবে। সাহিত্য দেবে তার প্রাণ, বিশ্ব-জগতে এনে দেবে অনাবিল তৃপ্তির পরিপূর্ণ

আভাস। বিজ্ঞানের কলা-কৌশল সে তৃপ্তির আলোকে হয়ে উঠবে ম্লান।

নিশীথ আবার যুক্তির অবতারণা করে কিন্তু তর্কের প্রাবল্যে যখন যুক্তির বাঁধন ডিঙ্গিয়ে যায় দুজনের, কথার বাঁধন তখন হয়ে যায় অসংলগ্ন। উভয়েই তারা নিজ নিজ মতের অনুকূলে অনর্গল বলে যায়, কিন্তু মীমাংসা হয় না কিছুই।

সভাপতি প্রবীন অধ্যাপক ঘোষ মশায় সস্মিত নয়নে চেয়ে থাকতেন এদের দুজনার প্রতি। শেষ বিচার অবশ্য তিনিই করে দিতেন। চশমাটা নাকের ডগা থেকে নামিয়ে আবার চোখে পরতেন। তারপর ওদের দুজনাকে দুদিকে নিয়ে বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন তিনি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান কেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। একের অভাবে অন্যের পুষ্টিসাধন কেমন করে অসম্ভব হয়। সাহিত্য আর বিজ্ঞান মানব জীবনের দুটো দিক কেমন করে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বিশ্ব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তারই একটা বিশদ বিবরণ তিনি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর কথায় ফুটে উঠতো নিশীথ আর নিখিলের একান্ত অনুসন্ধিৎসা, অজানাকে জানবার ঐকান্তিক প্রয়াস। কলা আর বিজ্ঞানের এই ছাত্র দুটি যে ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিশিষ্টস্থান অধিকার করবে, এ যেন তাঁর প্রতি ছত্রেই প্রকাশ পেতো।

ডিবেটিং ক্লাবের ব্যাপার শেষ হলেই দুজন আবার বের

হতো হাত ধরাধরি করে। সাময়িক কথা কাটাকাটির কোন রেখাপাতই তাদের মুখে আর দেখা যেতো না। সঙ্গে সঙ্গে চলে আসত কলেজের অন্যান্য ছাত্রেরা তাদের প্রতি প্রশংসমান দৃষ্টি নিয়ে। সমস্ত কলেজের ছাত্রেরা এদের নির্ব্বিচারে যেন নেতা মেনে নিয়েছিল।

ছাত্রদের মধ্যে কোন কোন ছাত্র থাকে, যাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব আর প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ দেখা যায়। এই সব ছাত্রদের ভেতর যখন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হয়ে দেখা দেয় তখন জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে অন্যান্য ছাত্ররা তার অনুগত হয়ে পড়ে। একটা সুপ্ত আকর্ষণী শক্তি যেন এদের পরিবেষ্টন করে চলেছে, একবার সংস্পর্শে এলে অনুগত না হয়ে পারা যায় না। সদ্‌গুণাবলীর অনুসরণ করতে মন যেন সত্যিই চায়। ওদের মধ্যে যে শক্তি আছে সেটার অনুসরণ করে তারই খানিকটা আয়ত্তের মধ্যে এনে নিজেকে তার সমান করে তোলবার প্রচেষ্টা তাই প্রত্যেকেরই হয়।

নিশীথ আর নিখিল ছিল এমনি ধরণের ছাত্র। দুজনের এমনি একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে কলেজের সমস্ত ছাত্র নির্ব্বিচারে তাদের মেনে চলতে দ্বিধা বোধ করতো না। দুজনের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল অসাধারণ। একজনের সাময়িক অভাবেও আর একজন অস্থির হয়ে উঠত। সব সময় প্রায়ই দুজনকে একই জায়গায় দেখা যেতো। কলেজের অন্যান্য ছাত্ররা তাই ঠাট্টা করে

ওদের বলত, মানিকজোড়। অথচ এদের দুজনার পরিচয় এই কলেজেই। দুজনা থাকতো বাংলার দুই সুদূর প্রান্তে, বীরভূম ও মৈমনসিং জেলার কোন অখ্যাত গাঁয়ে।

এই দুই তরুণ বাস করতো আশুতোষ মুখার্জী রোডের একটি মেসে। রাস্তার ধারের তেতালার একটা ঘরে ছিল এদের স্থান। নিখিলের টেবিলে থাকতো রাশিরাশি কবিতা আর রচনার খাতা, আর নিশীথ ঘরটাকে সাজিয়ে তুলেছিল এরোপ্লেন, রেডিও ইত্যাদির মডেল দিয়ে। কলা ও বিজ্ঞানে সেখানে মাঝে মাঝে হাতাহাতি হতো বটে, কিন্তু ডন ডাম্বেল কষা, গঙ্গায় গিয়ে সাঁতার দিয়ে আসা বা নানা প্রতিযোগিতায় যোগদান করে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার সময় এদের মিল ছিল অদ্ভুত।

সিঁড়ি থেকে নেমে নিখিল জিজ্ঞেস করলে, একটা মাস কি করবে এখন ?

নিশীথ বললে, ইলেকট্রনের চেয়েও ক্ষুদ্রতম অংশ কি বের করা যায় সেটার সম্বন্ধে ভাল করে একটা গবেষণা করব।

নিখিল হেসে বললে, দূর ! তার চেয়ে বরং আমার থিসিস্‌টা পড়ে শোনাব তোমাকে। অর্দ্ধেকটা হয়েছে এখন। মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্বেকার কাব্য নিয়ে আমার এই গবেষণা—

নিশীথ মুখ বেঁকিয়ে বললে, রেখে দাও তোমার থিসিস্‌, সময় নষ্ট করবার ফন্দী সব। তার চেয়ে বরং দিল্লী, আগ্রা বেড়ানো ভাল !

নিখিল সোৎসাহে বললে, সে তো খুব ভালই হয়। আগ্রার তাজমহল, কি সুন্দর।

তারপর আবৃত্তি সুরু করলে, তুমি শুধু নহ তাজ—

নিশীথ আস্তিন গুটিয়ে বললে, এই কলেজের মাঠে একটা প্রলয় কাণ্ড বেধে যাবে নিখিল। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, এখন কাব্য রেখে দাও বলছি।

নিখিল হেসে বললে, তবে চলো, রেস্তোরায় ঢুকে পড়া যাক্, সেখানে পেয়ালার কাব্য জুড়ে দেওয়া যাবে।

নিশীথ মাথা দুলিয়ে বললে, সেটা কতকটা সহ্য করা যায়. যদি চায়ের সঙ্গে 'টা' থাকে ? আমি বাস্তব মানুষ, তোমার কাব্যের ধার ধারি নে।

দুজনে আবার চলতে লাগল কলেজের গেট পেরিয়ে রেস্তোরার দিকে। নিখিল চলতে চলতে বললে, চলো এবার দার্জ্জিলিং থেকে ঘুরে আসা যাক্। দাদা থাকেন সেখানে। আজকালের মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন। তোমার বিজ্ঞান চর্চ্চার বাধা থাকবে না, আর আমিও আমার কাব্য চর্চ্চা সুরু করে দেবো।

নিশীথ উত্তর দিলে, প্রস্তাবটা তো লোভনীয় নিখিল, কিন্তু সম্ভব হয় কি করে ? তুমি তো জানো কাগজের উপর রঙের প্রক্রিয়া নিয়ে আমি একটা গবেষণা চালাচ্ছি। আমার এক্সপেরিমেণ্ট অনেকটা সফল হয়ে এসেছে। এই ছুটীটায় তাই

কলকাতা থেকে না গিয়ে এখানে বসেই সেটা শেষ করবো। তিন ভাগ কাজ আমার শেষ হয়ে এসেছে।

সামনে একটা রেস্তোরা দেখে দুজনেই ঢুকে পড়ল তাতে। গোটাকতক সেদ্ধ ডিমের ফরমাশ করে দুখানা চেয়ার দখল করে মুখোমুখি হয়ে তারা দুজনে বসল।

নিখিল মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, তাহলে তুমি বেড়াতে যেতে চাচ্ছনা বলো, বেশতো যদি দার্জ্জিলিং যেতে না চাও, তবে যেখানে ইচ্ছা চলো না; বদ্ধটায় কলকাতার গরম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচি।

নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, ঐত বললুম নিখিল! আমার যাবার সময় বা উপায় নেই। মানে গবেষণাটা শেষ না করে পাদমেকং ন গচ্ছামি। এখন বেরোলে প্রবীন অধ্যাপক মশায় ঘোরতর রুদ্ররূপ ধারণ করবেন। বিশেষতঃ এক্সপেরিমেণ্টটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। জানো নিখিল, এই গবেষণার ফলাফল? এটা বের হলে বিজ্ঞাপন জগতে বিজ্ঞানের অসীম দানের পরিচয় পাওয়া যাবে। বিজ্ঞাপনের চটকে ব্যবসার প্রসার হয় জানতো। বিজ্ঞাপনে যুগান্তর সৃষ্টি করবে আমার এই কৃষ্টিলব্ধ ফল। ফরমূলা-গুলো প্রায় সব লেখা হয়ে গিয়েছে। আজ যে এক্সপেরিমেণ্ট করে এলুম এটা অধ্যাপক মশায়ের পরামর্শ মতো সবটা লিখে ফেল্‌বো। তারপর ভালকরে কপি লিখে ফেলতে হ'বে। সত্যিই নিখিল আবিষ্কারের আনন্দে মন আজ আমার ভরে

আছে; সুতরাং তুমি যদি ইচ্ছা করো ভীমনাগের দোকান কি ফারপোর হোটেলে যেতে পারো আজ, অবশ্য এটা সেরে।

ডিম আর চা এসে পড়ল। চামচে দিয়ে একটা ডিম মুখে পুরে চিবিয়ে নিখিল চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে বললে, তাহলে তুমি একজন বড় বৈজ্ঞানিক হতে চলেছ দেখ্‌ছি।

নিশীথ নির্লিপ্তভাবে বললে, বড় ছোট বুঝিনে, এ শুধু আমার অধ্যাপকের স্নেহের দান। তিনিই গবেষণার পথ বাৎলে দিয়েছিলেন, আর শুধু পথ বলেই ক্ষান্ত হন নি, নিজে সক্রিয় সাহায্যও করেছেন। ভাবছি এর পেটেণ্ট একটা বের করতে হবে, আর সে পেটেণ্ট নিতে হবে আমাদের দুজনার নামেই। মুস্কিল এই, অধ্যাপক মশাই এ বিষয় রাজী হচ্ছেন না। এটা যদিও তাঁর সৃষ্টি, তবুও তিনি এর বিশদ বিবরণের খোঁজ রাখেন না; উচ্চতর আর একটা গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত আছেন তিনি। কাজেই আমার গবেষণার ফলাফল লিখে রাখতে হয়েছে আমাকে। এই ছুটীতে দেরাজের ভেতর থেকে কাগজগুলো গুছিয়ে ভাল করে লিখে রাখতে হবে আমায়।

চায়ের দোকানে আর একজন লোক নিবিষ্ট মনে নিশীথের কথাগুলি শুনে আসছিল। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিশীথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। নিখিল সে দৃষ্টির তীব্রতা দেখে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। পরনে তার শান্তিপুরে ধুতি। গায়ে আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবী। দেখে

একটি ফুলবাবু বলে মনে হয়। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় অভিজাত্যের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না; অথচ নিশীথের এই সমালোচনা সে যেন গিল্‌ছিল।

হঠাৎ নিখিলের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় সে চোখ নামিয়ে চায়ের পেয়ালায় মনোনিবেশ করলে। নিখিল একটু নিম্নস্বরে নিশীথকে বললে, ঐ লোকটাকে চেনো নাকি তুমি?

নিশীথ তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বললে, কৈ না। কখনো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না তো?

নিখিল বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, অথচ তোমার কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল। কি বুঝলে, ওই জানে! যেমনভাবে তাকিয়েছিল তোমার দিকে, ভাবলুম জানাশোনা আছে তোমার সঙ্গে।

নিশীথ হেসে বললে, মোটেই না, খেলার মাঠে হয়ত দেখে থাকবে।

এমনি সময় লোকটা চায়ের দামটা মিটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর নিশীথের সামনা সামনি এসে বললে, নমস্কার, অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হলো। নিশীথ একটু হতভম্বের মতো বললে, নমস্কার, আপনাকে ঠিক চিনতে পারছিনে। লোকটা তার কোন উত্তর না দিয়ে বললে, আচ্ছা আসি এখন, নমস্কার।

রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি

ডাকলো সে। নিশীথ আর নিখিল পাওনা চুকিয়ে বেরিয়ে পড়ল রেস্তোরা থেকে। লোকটা ততক্ষণে ট্যাক্সিতে চেপে পড়েছে। নিশীথ এগিয়ে বললে, পরিচয়টা জানা গেল না আপনার।

লোকটা একগাল হেসে বললে, তারজন্য আর চিন্তা কি? আচ্ছা আজই এক সময় মেসে গিয়ে পরিচয় দিয়ে আসব! এখন একটা বিশেষ কাজ আছে আমার। নম—"

ট্যাক্সি চলে গেল। নিশীথ বিরক্তিভরে বললে, একটা লোফার। নিখিল সন্দিগ্ধ মনে বললে, চোখ দুটো শয়তানের মতো, পকেটমার নয় তো?

দুজনেই পকেট পরীক্ষা করে দেখলে সব ঠিক আছে। নিশীথ বললে, চলো তবে ভীমনাগের দোকান থেকে ঘুরে আসা যাক্।

দুজনে যখন মেসে ফিরলো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মেসের চাকর জানালো দেশ থেকে এক বাবু এসেছেন। রাত্রে খাবেন জানিয়ে গেছেন।

নিশীথ ঘরে ঢুকে দেখতে পেলো, জিনিষ-পত্র সব লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। দেরাজ খোলা পড়ে রয়েছে। ভেতরে চেয়ে দেখলে কাগজপত্র সব খোয়া গেছে তার। সবিস্ময়ে নিখিলকে বললে, আমার কাগজপত্র ফরমূলা সবই চুরি গেছে নিখিল। দেখা গেল চোর টাকা পয়সা কিছুই নেয় নি, শুধু নিয়ে গিয়েছে নিশীথের গবেষণার কাগজপত্র। নিশীথ রুদ্ধশ্বাসে বললে, সর্ব্বনাশ!

দুই

কলকাতার গরম অসহ্য হয়ে পড়েছে। রাস্তার পিচগুলো গলতে সুরু করে দিয়েছে। রোদের ভেতর যেন আগুনের ফুল্‌কি ভেসে বেড়াচ্ছে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে হয় যেন চোখ ঝাল্‌সে যাবে। ঘরগুলো তেতে পুড়ে এমনি অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, তার ভেতরে থাকাও মুস্কিল অথচ বাইরে যাবারও কোন উপায় নেই। গরম বাতাস পাতলা হয়ে যেন দম বন্ধ করে দেবার উপক্রম করছে। মাথার উপর ইলেক্‌ট্রিক পাখা বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে, কিন্তু তার তপ্ত হাওয়া যেন ঘরটার উষ্ণতা দূর করতে পারছে না। নিশীথ আর নিখিল ঘরের মধ্যে সামনা-সামনি বসে গলদ্‌ ঘর্ম্ম হতে লাগল। একটা বর্ষণ যে শীঘ্রই হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সূর্য্য রশ্মির এই তীব্র প্রখরতা আর গুমোট গরম একটা আশু বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বাভাষ, এটা নিশীথের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আগেই আঁচ করে ফেলল।

একটা দুশ্চিন্তার ভেতর দিয়ে গত রাতটা কেটে গেছে নিশীথের। আজ সকাল থেকে সে ফরমূলাগুলো নিজের মন থেকে আবার গুছিয়ে লেখবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু যতই লেখছে, ততই যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। একবার অধ্যাপক মশায়ের কাছে তার যাওয়া দরকার সমস্যার সমাধানের জন্য, অথচ এই রোদের মধ্যে বেরোনোও মুস্কিল। অধ্যাপক মশায়ও

হয়ত কলেজ থেকে এখনও ফেরেন নি। অধ্যাপক মশায়ের লাবরেটারীতে এর সমাধান করতে হবে।

নিখিল ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা মুছে বললে, আমার মনে হয় নিখিল, এ সেই কালকের লোকটার কাজ। তোমার কথাগুলো যেন সে গিলছিল। কিন্তু আমাদের ঠিকানা জানলে কি করে?

নিশীথ ভ্রুকুঞ্চিত করে বললে, লোকটাকে আমি যেন আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। কলেজের লাবরেটারীতে আর অধ্যাপক মশায়ের বাসার আশে-পাশে অনেক ঘুরেছে। তখন এ বেশ ছিল না ওর। মুখের আঁচিলটার জন্য কেমন যেন আমার মনে সন্দেহ হয়, মনে হয় এই লোকটাই সে।

নিখিল আবার জিজ্ঞেস করলে, আমাদের ঠিকানা—

নিশীথ বাধা দিয়ে বললে, ঠিকানা পেতে বেশী বেগ পেতে হয় না। কলেজের সব ছেলেই আমাদের চেনে। হয়ত কারো কাছে জেনে নিয়েছে সেটা। কিন্তু ফরমূলা দিয়ে করবে কি তাই ভাবছি। সবগুলো ফরমূলা লেখাও নেই ওতে। এ দিয়ে পেটেণ্ট নেওয়া চলবে না ওর। আমার ক্ষতি করেছে যথেষ্ট কিন্তু ওর বিশেষ কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না।

নিখিল বললে, কেন যেটুকু পেয়েছে, তারই ফলাফল পেটেণ্ট করে নেবে। নিশীথ একটু হেসে বললে, তাতে কোন লাভ হবে না। আর ফরমূলার কতকাংশ রয়েছে সাঙ্কেতিক ভাষায়। আমি ছাড়া এর পাঠোদ্ধার সম্ভব হবে না, সুতরাং সবই

পণ্ডশ্রম হবে ওর। এখন অধ্যাপক মশায়ের মনে থাকলে হয় সবটা! নচেৎ আবার গোড়া থেকে সুরু করতে হবে আমায়।

নিখিল বাইরে তাকিয়ে বললে, রোদের তেজ এখনও কমে নি। বেলা একটু পড়ন্ত হলে বের হয়ো। আজ আবার আমার দাদার আসবার কথা রয়েছে, নইলে তোমার সঙ্গে যেতুম। দাদা বাড়ী থেকে এসে এখানকার কাজ সেরেই দার্জ্জিলিং যাবেন। ভাবছি তুমি যদি যাও তাহলে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। কলকাতার এ অসহ্য গরম আর বরদাস্ত হচ্ছে না।

নিশীথ একটু হতাশ হতে বললে, যেতে পারলে খুব সুখী হতুম নিখিল। কিন্তু যাই কি করে বলতো, আমার এই সাধনার একটা শেষ ফল দেখতেই হ'বে। দেখছ তো মাঝ পথেই কি বিপত্তি এলো। ভাগ্যিস্ কায়দা করে লিখেছিলুম্, তাই হয়ত পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর হতে পারে। জানিনে এর পরেও কোন বিপত্তি আসবে কিনা! তবে এবার ফরমূলাগুলো খুব সাবধানে রাখবো। মেসে রাখা ঠিক হবে না।

নিখিল জিজ্ঞেস করলে, তোমার এই ফরমূলাগুলো এত লোভনীয় হলো কি করে? নিশীথ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, কেন? তোমাকে আগেই বলেছি নিখিল;—এ আনবে বিজ্ঞাপন-জগতে যুগান্তর। আর তাছাড়া এর ভেতর এমন সব ফরমূলা রয়েছে, যা দিয়ে যে কোন ছবির অবিকল নকল

তোলা যায়। বিজ্ঞান-জগতে বিস্ময় বলে কিছু নেই। আজ যা তোমার কাছে আশ্চর্য্য বলে মনে হবে, বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায় কালই তা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে আসবে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি কৌশলে। আমার এ আবিষ্কার সত্যিই একটা নূতন পথ দেখাবে। আর তাছাড়া তুমি যদি বিশদ্ ভাবে সব জানতে চাও তবে টেবিলে এসে বসো, সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে তোমার ঐ কবিতার খাতাগুলো দেরাজে বন্ধ করে ফেল। ওগুলো যেন কিছুতেই বরদাস্ত হয় না আমার। খাতাগুলো নজরে পড়লেই ফরমূলা সব ওলট পালট হয়ে যায়।

নিখিল খাতাগুলো দেরাজে বন্ধ করে বললে, তাই হোক্ তোমার বিশদ ব্যাখ্যাই আগে শুনি। তারপর তোমার ফরমূলা-গুলো অবলম্বন করেই কবিতা রচনা করা যাবে।

নিশীথ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, তবে যাক্, তোমার আর বোঝবার দরকার নেই। একেই সম্বল হারিয়ে মাথা খুঁড়ছি, তার মধ্যে তুমি চালাচ্ছ মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা। এ বেটা চোরও কেমন যেন এক চোখো! আমার ফরমূলাগুলো না নিয়ে যদি ঐ কবিতার খাতাগুলো নিতো, হাঁপ ছেড়ে বাঁচতুম আমি। এ যেন লক্ষ্মণের শক্তিশেল হয়েছে। নিখিল হেসে বললে, লোকটা তোমারই মত নেহাৎ অকবি দেখছি, তাই এগুলো নজরে পড়েনি। এতো ফরমূলা নয় যে টপ করেই বেরোবে

মন থেকে। এ হচ্ছে কবিতার ছন্দ, যা যায় সেটা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। মন বনে ছন্দ যে কখন দোলা দেবে—

নিশীথ কৃত্রিম রাগ করে বললে, তবে উঠলুম আমি, এই রোদেই বেরোতে হবে দেখছি।

নিখিল এগিয়ে এসে বললে, নাও এবার বৈজ্ঞানিক হবার চেষ্টাই করা যাক্। সব গুছিয়ে বল দেখি।

দুজনার ভেতর তখন চলল, বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোচনা। নিখিল অবাক্ হয়ে নিশীথের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি শুনতে লাগল। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে নিশীথ বিজ্ঞানের একটা দিক্ কি সুন্দর ভাবে আবিষ্কার করেছে দেখে সে উৎফুল্ল হলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক চললো তাদের আলোচনা। বিজ্ঞানে নিশীথের গভীর জ্ঞান কলাবিদ্ নিখিলেরও বিস্ময় আনয়ন করছিল।

হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে নিশীথ সচকিত হয়ে বারান্দার দিকে তাকিয়ে বললে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কে?

নিখিল সচকিত হয়ে বললে বাইরে লোক দাঁড়িয়ে আছে নাকি? দাদা এসেছেন বোধ হয়।

দুজনেই ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বাইরে এলো। দেখা গেল নিখিলের দাদা নন। একজন প্রৌঢ় লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন বারান্দার রেলিং ধরে। তিনি হয়ত নেমে যাবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়িতে সেটা সম্ভবপর হয় নি।

ভদ্রলোকের পরণে সাদা থান। গায়ে সাদা পাঞ্জাবীর উপর সাদা চাদর জড়ানো। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। চোখে একটা সান গ্লাস দেওয়া আছে। মুখে বোধহয় ফোড়া হয়েছে। তার উপরে একটা কাপড়ের পটী লাগানো থাকায় মুখটার একটা অস্বাভাবিক রূপ দেখা যাচ্ছিল। এই মেসে এই প্রৌঢ় ব্যক্তি কে এলেন নিশীথ সেটা ভেবে ঠিক করতে পারলো না।

নিখিল একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, আপনি কে ?

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, "আমার নাম বিপদ-বরণ বসু, আমি আপনাদের নীতিশচন্দ্রের কাকা," ভদ্রলোক পাশের ঘর দেখিয়ে বল্লেন, "এই ঘরেই নীতিশ থাকে শুনলুম, এখনও বোধহয় কলেজ থেকে ফেরেনি ?"

নিশীথ অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে, ও আপনি নীতিশের কাকা, আসুন ভেতরে বসুন।

নিখিল একটু অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। নীতিশের বাবাকে সে চেনে। দিব্য গড়ন তাঁর। চুলগুলো কাল, গৌরবর্ণ, দেখলেই একটা ভক্তির ভাব আসে। অগাধ বিদ্বান তিনি। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নেই। প্রত্যেকটি বিষয়েই ভদ্রলোক তাঁর বিপরীত আকৃতি নিয়ে জন্মেছেন। নিখিল ভাবলে, ভদ্রলোক নীতিশের কাকা না হয়ে জ্যাঠামশায় হলে বরঞ্চ মানাতো, বিসদৃশ চেহারা মেনে নিলে অবশ্য।

ভদ্রলোক ভেতরে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। নিশীথ কুণ্ঠিত হয়ে বললে, নীতিশের কাকা হয়ে আপনি বাইরে রোদে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যা রোদ উঠেছে আজ! আমাদের ঘরে এসে বসলেই পারতেন। ভদ্রলোক একটু আমতা আমতা করে বললেন, ইচ্ছে ছিল তাই বসবো, কিন্তু দেখলুম আপনারা দুজনে কি যেন আলোচনা করছেন। তাই আর আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটালুম না।

নিশীথ হেসে বললে, ও কিছু নয়। ওরকম আলোচনা আমাদের দিন রাতই লেগে থাকে। বিজ্ঞানের একটা বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছিল। ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে বললেন, বিজ্ঞানের বিষয়? কি নিয়ে বলুন তো? নিশীথ কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললে, ও কিছু নয়? কাল আমার বিজ্ঞানের কয়েকটা ফরমূলা চুরি গিয়েছে কিনা, তাই নিখিলকে বোঝাতে চাইছিলুম, সে গুলো চোরের কোন কাজে আসবে না। মানে, আমি ছাড়া ঐ ফরমূলাগুলোর সমাধান আর কেউ করতে পারবে না?

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, তাইত? চোর বেচারী তো তাহলে বেশ জব্দ হ'বে। সমস্ত পরিশ্রম তার বৃথাই যাবে দেখছি?

নিশীথ সায় দিয়ে বললে, ঠিক তাই! মাঝ থেকে আমার কাজের অসুবিধা সৃষ্টি করে গেল। ফরমূলাগুলো হাতে পেলে

আমি আজই সব সেরে ফেলতে পারতুম। অবশ্য এখনও পারবো, তবে সময় লাগবে তাতে। ভদ্রলোক মনোযোগের সঙ্গে নিশীথের কথাগুলো শুনছিলেন। তার ভাবভঙ্গী দেখে নিখিলের বিরক্তি হচ্ছিল। নিশীথের এতো খোলা মন নিয়ে এসব আলোচনাও তার ভাল লাগছে না। কথার মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্য তাই সে বললে, নীতিশের তো কলেজ থেকে আসতে অনেক দেরী হবে; আপনার জন্য চা আনতে বলে দেব কি?

ভদ্রলোক উচ্চ হাস্য করে বললেন, এই দুপুরে? না চায়ের অত বাতিক আমার নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ এই বিজ্ঞানের আলোচনাই চলুক না কেন? বেশ ভাল লাগছে আমার।

নিখিল বাধা দিয়ে বললে, ওকে আর ঘাঁটিয়ে বিশেষ লাভ নেই বিপদবরণ বাবু, কাল থেকে ফরমূলা হারিয়ে অবধি ওর মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে।

ভদ্রলোক তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে নিখিলের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, সেইটেই তো স্বাভাবিক, একটা পয়সা হারিয়ে গেলে মন ছট্‌ফট্‌ করে, আর এতো দীর্ঘকালের সাধনার ধন! তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে, এতে চোরটার কিছুই সুবিধে হবে না। ফরমূলাগুলো বোধ হয় আসল নয়।

নিশীথ হেসে বললে, না তা নয়। ফরমূলা আসলই, তবে তার পাঠোদ্ধারে দরকার হবে আমার সহায়তা। নইলে অরণ্যে রোদন হবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, তাহলে চোরের উচিত ফরমূলাগুলো এনে আপনার কাছে হাজির করা। অথবা আপনাকেই ফরমূলার কাছে হাজির করা।

ভদ্রলোক নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে সুরু করে দিলেন। নিশীথও তার হাসির সঙ্গে যোগ দিল।

নিখিল হঠাৎ বলে উঠল, তোমার এখন যাবার সময় হয়েছে নিশীথ।

নিশীথ চকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, রোদটা অনেকটা কমে এসেছে নিখিল। তুমি ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করো, নীতিশ হয়ত এর মধ্যেই এসে পড়তে পারে। আমি সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসে দাদার সঙ্গে দেখা করবো, একথা বলো তাঁকে।

নিশীথ গায়ে জামা দিতে লাগল দেখে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমিও উঠি এখন। সন্ধ্যার সময় এসে নীতিশের সঙ্গে দেখা করে যাব'খন। নীতিশ এলে বলবেন আমার কথা।

তিনজন সিঁড়ি বয়ে নেমে রাস্তায় এলো। একটা মোটর দাঁড়িয়েছিল সেখানে। ভদ্রলোক মোটরে উঠে চড়ে বসলেন। মোটরখানা বেশ দামী।

নিখিল একটু অবাক্ হয়ে মোটরখানার দিকে চেয়ে রইল। নীতিশের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, সে জানত। স্কলারসিপের

টাকার সঙ্গে তার বাবার দেওয়া সামান্য টাকায় তাকে মেসের খরচা চালাতে হতো। সকাল বেলা পড়া নষ্ট করে একটা টিউশনি পর্য্যন্ত নিতে হয়েছে তার। তার এই ধনবান্ কাকাটির ইতিহাস সে কখনো শোনেনি। আজ এই মোটরের পারিপাঠ্য দেখে নীতিশের কষ্টের কথা মনে করে নিখিলের মনে একটা ঘৃণার ভাব এনে দিলে।

নিখিল একটু এগিয়ে জিজ্ঞেস করলে, নীতিশের নামে কোন চিঠি রেখে যাবেন কি ? আপনার ঠিকানাটা পেলে নিজেই যেতো আপনার ওখানে।

ভদ্রলোক মুখ বাড়িয়ে বললেন, চিঠি। না, তার কোন আবশ্যকতা নেই। ঠিকানা নীতিশ জানে। আর সন্ধ্যার সময় আমি নিজেই আবার আসছি সুতরাং এ সবের কোন আবশ্যকতা নেই। তারপর নিশীথের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আপনার ফরমূলার কথা আমার মনে রইল কিন্তু, সন্ধ্যাবেলায় এসে সব শুনবো আপনার মুখে। নূতন করে তৈরী করে ফেলুন। এমন সুন্দর জিনিষটা আর নষ্ট হতে দেবেন না।

নিশীথ মাথা দুলিয়ে জানালো নিশ্চয়। চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেতে প্রবৃত্তি হয় না আমার।

ভদ্রলোক মোটরের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে নিশীথের হাত চেপে ধরে বললে, এইতো বৈজ্ঞানিকের মত কথা! দ'মে যাবেন না যেন। মন ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকে।

এই গায়ে-পড়া আত্মীয়তা নিখিলের ভাল মনে হচ্ছিল না, কিন্তু বাধা দিলে দুর্ব্বল মনে নিশীথ ব্যথা পাবে ভেবে চুপ করে রইল।

সোফার মোটরে ষ্টার্ট দিল। ভদ্রলোক কি যেন ভেবে দরজাটা খুলে বললেন, আসুন না এই মোটরে? আপনাকে যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে যাব। নইলে এই রোদ্দুরে হেঁটে যেতে কষ্ট হবে আপনার। কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে কিছুক্ষণ।

নিশীথ বাধা দিয়া বললে, না ধন্যবাদ! সন্ধ্যার সময় আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তখন শুনবেন সব। এখন আমার নানান জায়গায় যেতে হ'বে। আচ্ছা নমস্কার।

উত্তরের কোন অপেক্ষা না করে নিশীথ পাশের গলিতে ঢুকে গেল। দূর থেকে বলে উঠল, নিখিল আসতে একটু দেরী হলে খাবারটা ঘরে ঢেকে রেখে দিতে ব'লো।

নিশীথ দ্রুতপদে চলে গেল। ভদ্রলোক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন। মোটর তখনও দাঁড়িয়ে শব্দ করছিল।

ভদ্রলোক দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা মুছে ফেলে রুমালটা পকেটে রেখে দিলেন। মোটরের ভেতর থেকে মুখ বের করে নিখিলের দিকে তাকিয়ে বললেন নমস্কার। রুমালে মুখ মুছে ফেলার সময় অজ্ঞাতসারে কাপড়ের পটী খুলে পড়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের মুখ থেকে।

নিখিল প্রতি-নমস্কার করতে ভুলে গেল। আশ্চর্য্য! এযে তার চেনা মুখ বলে মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছে ঠিক যেন ঠাহর হচ্ছে না, অথচ বেশ পরিচিত। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিখিল তার পরিচয়টা মনে আনার চেষ্টা করতে লাগল।

ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ হয়ে আবার নমস্কার জানালেন। অন্যমনস্কতা বশতঃ নিখিল প্রতি-নমস্কার না জানিয়ে বললে, আপনার কাপড়ের পটীটা খুলে গিয়েছে।

ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন। সন্ত্রস্ত হয়ে মুখে হাত দিয়েই তীব্র দৃষ্টিতে নিখিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরক্ষণেই মোটর ষ্টার্ট দিল। নিখিল মুখখানা আর একবার ভাল করে দেখবার চেষ্টায় এগিয়ে যেতেই রিভলভার শুদ্ধ একটা হাত বেরিয়ে এলো মোটরের ভেতর থেকে।

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে নিখিল পিছিয়ে এলো। মোটর তীব্রবেগে ছুটে চলে গেল। নিখিল হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

তিন

মেসে ফিরেই নিখিল দেখতে পেল তার দাদা এসে গেছেন। ফ্যানটা পুরোদমে খুলে দিয়ে একটা ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে দিব্যি হওয়া খাচ্ছেন। হাওয়ার প্রকোপে ইংরাজী সংবাদপত্রটি টেবিল থেকে ঘরটার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নিখিল ঘরে ঢুকে একটু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কোন পথে তুমি এলে দাদা, আমি যে রাস্তায় ছিলুম এতক্ষণ!

নির্ম্মলবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, দেখলুম তোরা দুজন একজন মোটর বিহারী লোকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছিস। কাজেই সটান ঢুকে পড়লুম মেসের ভেতরে। ভদ্রলোকটি কে? একটু চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে যেন।

নিখিল আদ্যোপান্ত সব খুলে বললে দাদাকে। নির্ম্মলবাবু সব শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, খুব শক্ত একটা দলের পাল্লায় পড়ে গেছ তোমরা দেখছি। ঐ আঁচিলওয়ালা লোকটা বড় সোজা নয়। মস্ত বড় দলের একজন বড় সাক্‌রেদ। দার্জ্জিলিং-এ একবার আফিম চালানের অপরাধে ধরা পড়েছিল, সেই সময়ে আমি দেখেছি। অত লোকের ভেতর সদর রাস্তার মধ্যে কি করে উধাও হলো সেই ভাবি। জানি না, ঠিক সেই লোকটা কি না? ঠিক এই রকম মুখে পটী লাগানো বুড়োর বেশেই

ছিল সেদিন। ওর আদত চেহারা অবশ্য দেখবার সুযোগ হয় নি।

নিখিল বলে উঠল, আমি দেখেছি দাদা, সেদিন রেস্তোরায়। বয়স মোটেই বেশী নয় ওর। কি চমৎকার সাজতে পারে। দিব্যি সেদিন মেসের চাকরকে ঠকিয়ে কাগজপত্রগুলো নিয়ে গেল। আর আমিই কি আজ চিনতে পেরেছি, মুখ থেকে পটী খুলে গেল তবে না চেনা গেল, তাও ভাল করে চেনবার চেষ্টা করতেই যে রিভলভার দেখাল! ভাগ্যিস্ গুলি করে নি।

নির্ম্মলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, গুলি করবার জন্য তো আর রিভলভার বের করেনি। তোমাকে ভাল করে চেনবার সুযোগ না দেবারই ইচ্ছা ছিল তার। আর তাছাড়া তুমি মোটরে উঠে একটা হৈ চৈ বাধিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে না তোল, তাই একটু ভয় দেখিয়ে গেল। আরও অনেক মতলব ওর মাথায় গিজ্‌গিজ্‌ করছে। কিন্তু সেগুলো যে কি তাই ঠিক করতে পারছিনে। মোটকথা তোমাদের দুজনের এখন খুব সাবধানে থাকতে হবে। তোমাদের পেছনে যখন লেগেছে তখন সহসা ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।

নিখিল বিরক্তিভরে বললে, আফিম-চোর আমাদের পেছনে লেগে গেল কেন, এটা তো মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। আফিম-চোর ঐ সব ফরমূলা দিয়ে কি করবে? এতো আর আফিমের ফরমূলা নয়।

নির্ম্মলবাবু একটু ভেবে বললেন, হয়ত ফরমূলাগুলো পেটেণ্ট করে নেবে। নয়ত বেচে দেবে কারো কাছে। সে ওগুলো নিজের নামেই চালিয়ে নেবে।

নিখিল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, সে কি করে হবে। অধ্যাপক মশায় সাক্ষ্য দেবেন নিশীথের পক্ষ হয়ে। মামলা মোকর্দ্দমা হলে শাস্তি পাবে তার।

নির্ম্মলবাবু হেসে বললেন, সে পরের কথা। তাছাড়া ফরমূলা যে কেউ আবিষ্কার করতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা একই বিষয় ভেবে থাকেন, অবশ্য এক্ষেত্রে ভাবার প্রকার ভেদ হয়েছে বলতে হবে। এই বিশাল পৃথিবীতে এরকম জ্ঞান-চুরি অহরহ হয়ে আসছে। তবে আফিম-চোর যখন জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে, তখন পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক হবার চেষ্টা করবে কিনা বলা যায় না।

নিখিল বললে, কিন্তু এতে ওর সে বিষয়ে সুবিধে হবে না। নিশীথ ছাড়া ফরমূলা অন্য কারও বোঝবার সুবিধে হবে না। এমনি ভাবে ফরমূলাগুলো নাকি নিশীথ লিখেছে। ওর পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে শেষে।

নির্ম্মলবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, সেইটেই চিন্তার কথা নিখিল। ফরমূলার ব্যাপার ষোল আনা জেনে নেবার চেষ্টা করাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক। কাজেই সহজে তোমাদের নিষ্কৃতি দেবে মনে হচ্ছে না। দেখছি এ মেসের সব খবর ওদের জানা

রয়েছে। হয়ত কোন নিজের লোকই রয়েছে মেসের মধ্যে। এমেসে থাকাও তোমাদের নিরাপদ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ভালকথা, আমি এসেছি আমাদের কলকাতার বাসার একটা বন্দোবস্ত করতে। ভাড়াটে বদ্‌লী হয়ে গিয়েছেন দিল্লীতে। ঐ বাড়ীটায় তোমরা গিয়ে থাকো দুজনে। নতুন ভাড়াটে আর বসানো হবে না। দেশ থেকে ঠাকুর চাকর দারোয়ান এসে থাকবে। মোহিতকে আমি সেই ভাবেই বলে যাব। এবার এসে ওখানেই উঠেছি আমি।

মোহিত নির্ম্মলবাবুর বন্ধু। নির্ম্মলবাবুর মত চির-কুমার। সারা ভারত আর বিদেশ ভ্রমণ করে এসেছেন নির্ম্মলবাবু তার সঙ্গে। বিলাতী দুচারটা ডিগ্রীও দুজনে জুটিয়েছেন দস্তুর মতো পড়াশোনা করে। কিন্তু চাকরীর চেষ্টা না করে দুজনে নেমেছেন ব্যবসায়। ব্যবসা এখন ভালভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। নির্ম্মলবাবু তাই দার্জ্জিলিংএর বাসাকে ছোট খাট একটা লাইব্রেরী বানিয়ে তুলেছেন। সেখান থেকেই ব্যবসার কাগজ-পত্র দেখতে হয়। মাঝে মাঝে কলকাতায় এলে হোটেল বা মোহিতবাবুর ওখানেই উঠে থাকেন।

নিখিল অনুযোগের সঙ্গে বললে, তুমি একবারও আমার এখানে এসোনা কেন দাদা ?

নির্ম্মলবাবু হেসে বললেন, তোমাদের অধ্যয়নে বাধা দেবার সুযোগ দিতে চাইনে আমি। যাক্ ওসব অনুযোগের প্রয়োজন

নেই। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে নিখিলের হাতে দিয়ে বললেন, মেসের চাকরটাকে দিয়ে কিছু খাবার নিয়ে এসো। মোহিতের কেক বিস্কুট খেয়ে ক্ষিধেটা যেন আরও বেড়ে উঠল। ওসব হোমিওপ্যাথিক ভোজ খাওয়া আমার পোষায় না।

সত্যি, নির্ম্মলবাবুর চেহারা একটা দেখবার মত জিনিষ। পেশীবহুল সুপুষ্ট দেহ সুঠাম ছাঁদে তৈরী। দার্জ্জিলিংএ থেকে গৌরবর্ণ চেহারা আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। খেতেও পারেন খুব।

নিখিল মেসের চাকরটাকে খাবার আনতে বলে দিয়ে ফেরার পথে নীতিশকে দেখতে পেয়ে নির্ম্মলবাবুর কাছে নিয়ে এলো।

নির্ম্মলবাবু সোৎসাহে বললেন, এই যে নীতিশ, তোমাকেই খুঁজছি আমি। এত দেরী করে এলে যে তোমার খুড়ো মশায়ের সঙ্গে দেখা হলো না তোমার।

নীতিশ অবাক্ হয়ে বললে, আমার খুড়ো ?

নির্ম্মলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, বাঃ সেই খুড়ো, যার মুখে রয়েছে মস্ত আঁচিল। কাপড়ের পটী দিয়ে আঁচিলটা মাঝে মাঝে ঢেকে রাখেন। মস্ত দামী মোটরে চড়ে বেড়ান। বেশ দিব্যি বুড়ো একজন।

নীতিশ হেসে বললে, এমন কোন খুড়োর সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার হয় নি, আর তাছাড়া আমার কোন খুড়োই

নেই। আছেন জ্যাঠামশায় একজন, আশীবছর বয়স তাঁর। এখন তিনি নড়াচড়াই করতে পারেন না।

নির্ম্মলবাবু গম্ভীর হবার ভান করে বললেন, এই দেখ, ভদ্রলোক মোটরে চড়ে এসে এখানে পরিচয় দিলেন নীতিশের খুড়ো হই আমি। এই ঘরে বসে দিব্যি ফ্যানের হাওয়া খেয়ে গেলেন, অথচ তুমি বলছ তোমার খুড়োই নেই। ভদ্রলোক জানতে পারলে কি রকম রেগে যাবেন বলতো ?

নীতিশ কুণ্ঠিত হয়ে বললে, সত্যিই আমার নিজের কোন খুড়ো নেই নির্ম্মলদা, তবে যদি কেউ আমার খুড়ো বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন সেকথা আলাদা। তাঁকে দেখলে বলতে পারি, তিনি কে ?

নির্ম্মলবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, সেইটেই তো সমস্যার কথা। বিভিন্ন সময়ে এমনি বিভিন্ন পোষাকে তিনি ঘুরে বেড়ান যে তাকে দেখলেও চেনা যায় না। তবে ঐ আঁচিলটাই মাঝে মাঝে স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়। আশ্চর্য্য ! বেচারা আগুন নিয়ে খেলে বেড়ায় অথচ আঁচিলটা এখনও পুষে রেখেছে কেন তাই ভাবি !

নীতিশ অবাক্ হয়ে বললে, ব্যাপার কি ?

নিখিল সব কথা খুলে বললে তাকে। নীতিশ রুদ্ধশ্বাসে সব শুনে উৎকন্ঠিত হয়ে বললে, সর্ব্বনাশ ! এই অলক্ষুণে লোকটা আমাদের পেছনে লাগল কেন।

নির্ম্মলবাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, সর্ব্বনাশের সূত্রপাত কেবল হয়েছে নীতিশ। ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে সেইটেই ঠিক করে উঠা যাচ্ছে না; সুতরাং এখন থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় থাকতে হবে তোমাদের। তোমাদের তিনজনেরই মেস ছেড়ে থাকার দরকার হয়ে পড়েছে। আমাদের কলকাতার বাসা খালি পড়ে রয়েছে। ওখানেই তোমরা থাকবে। এখন নিখিল আর নিশীথকে নিয়ে আমি দার্জ্জিলিংএ থাকছি। মোহিতের ওখানে তোমার থাকবার ব্যবস্থা করে যাব, যে পর্য্যন্ত দেশ থেকে লোকজন না আসে তুমি সেখানেই থাকবে।

মেসের চাকরটা খাবার দিয়ে গেল।

নির্ম্মলবাবু বললেন, তোমরা চট্‌পট সেরে নাও। খাবার খেয়েই বেরোতে হবে নিশীথের সন্ধানে। বেচারা ফরমূলা নিয়ে মত্ত আছে। অধ্যাপক মশায়ের বাসা থেকে সন্ধ্যের আগেই ফিরিয়ে আনতে হবে ওকে। নইলে রাত-বেরাতে আঁচিল-ওয়ালা পথ আগলে ধরতে পারে ওর ফরমূলার জন্যে। দেখেছ তো ওর হাতের রিভলভার!

নিখিল মৃদু হেসে বললে, নিশীথ অত ভীতু নয় দাদা, আর তাছাড়া ও বোধহয় একটু আঁচ পেয়েছে। নইলে মোটরে না চড়ে গলিপথে তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন?

নির্ম্মলবাবু একটা সন্দেশ মুখে পুরে বললেন, নিশীথটা খুব সাহসী তা জানি। কিন্তু এটা হয়ত তার খেয়াল। ছোটবেলায়

তুমি খুব ভীতু ছিলে নিখিল। ঢাকের শব্দ শুনে মাকে জড়িয়ে ধরতে ভয়ে।

নিখিল লজ্জিত হয়ে বললে, জানি কিন্তু তখন শরীর খুব দুর্বল ছিল কিনা তাই। কিন্তু এখন দেখ আমার মাসল কেমন শক্ত হয়েছে। পাহাড় বেয়ে উঠতে পারি এখন।

নির্ম্মলবাবু হাসতে লাগলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নির্ম্মলবাবু নিখিল আর নীতিশকে সঙ্গে নিয়ে নিশীথের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন। অধ্যাপক মশায়ের বাসায় যেতে তাঁর মেয়ে এসে সংবাদ জানাল, অধ্যাপক মশায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে জনৈক বিদেশী বৈজ্ঞানিকের সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগ দিতে গেছেন। নিশীথ তাঁর সন্ধানে এসেছিল বটে, কিন্তু সেও সম্ভবতঃ সেই সম্বর্দ্ধনা সভায় গিয়ে থাকবে।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে বিপুল জন সমাগম। ভিড়ের মধ্যে নির্ম্মলবাবু নিশীথের কোন সন্ধান পেলেন না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিচ্ছেন একজন বৈজ্ঞানিক। তিনজনে তন্ময় হয়ে তাই শুনতে লাগলেন।

সভা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাপক মশায় বের হয়ে এলেন। নিখিল তাঁর কাছে গিয়ে নিশীথের সন্ধান করতেই তিনি বলে উঠলেন, নিশীথ গেছে কলেজের লাবরেটারীতে। শুনলুম তার ফরমূলাগুলো সব চুরি গেছে। ফরমূলার সবগুলো আমার মনে নেই, তাই ওর দু'চারটে এক্সপেরিমেণ্ট করা দরকার।

একবার যখন সন্ধান পাওয়া গেছে তখন ফরমূলা তৈরী করা যাবে নিশ্চয় ; তবে কিছু বেগ পেতে হবে।

অধ্যাপক মশায়কে নমস্কার জানিয়ে নিখিল দাদাকে সঙ্গে নিয়ে কলেজে এলো। কলেজ বন্ধ। দারোয়ান জানালে সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিশীথবাবু মেসে চলে গেছেন। দারোয়ান নিশীথকে চিনতো।

সকলে নিশ্চিন্ত মনে মেসে ফিরে এলো।

কিন্তু নিশীথকে মেসে পাওয়া গেল না। বরং দেখা গেল নিশীথের বিজ্ঞানের বই, খাতাপত্র, নোট ইত্যাদি কিছুই নেই ঘরের মধ্যে। তিনজনেই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে নিশ্চল অবস্থায় ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে রইলেন।

মেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন, নিখিল এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জানালো, স্যার আমাদের ঘরে চুরি হয়ে গেছে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাথা নেড়ে বললেন, না চুরি হয়নি। নিশীথ সন্ধ্যার সময় নিজে এসে তার বইগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেছে। নিশীথটা যে আজকাল কি হয়েছে, কিছুই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারিনে। এত প্রশ্ন করলুম তাকে কোনটারই উত্তর দিল না সে। কেমন যেন অস্বাভাবিক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল সে। লেখাপড়ায় আর অন্যান্য বিষয়ে তাকে ভাল ছেলে বলেই জানতুম, কিন্তু আজকের এই ব্যবহার আমি কল্পনাও করতে পারিনে। আমায়

এমন ভাবে তাচ্ছিল্য করা ওর মোটেই উচিত হয়নি। মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর। ব্যাপার দেখে তাই মনে হয় আমার।

নিখিল সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে জানালে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, মনে খুব একটা আঘাত পেয়েছে বোধ হয়। হয়ত ল্যাবরেটারীতে কোন সুফল পায়নি। যাই হোক্ আর কোন গুরুতর কাণ্ড না করে বসে তোমরা সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

নিশীথ রাত্রে মেসে ফিরলো না দেখে নির্ম্মলবাবু মেসেই কাটালেন সে রাত। পরের দিন নিশীথের খোঁজ করা হলো সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব জায়গায়। বাড়ী থেকে টেলিগ্রামের উত্তর এলো, সেখানে সে যায়নি। সমস্ত কলকাতায় নানারকম সন্ধানই চললো তার, কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। নিখিল হতাশ হয়ে বললে, একবার পুলিশে খবর দিলে হয় না দাদা।

নির্ম্মলবাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন, এতো ছোটে ছেলে নয় নিখিল, যে হারিয়ে গেছে। মনে হয় নিশীথ মনে খুব আঘাত পেয়েছে তাই হয়ত কোনও জায়গায় চলে গিয়েছে, ব্যথাটা কমলে পর ফিরে আসবে। নয়ত ঐ আঁচিলওয়ালার পাল্লায় পড়েছে ফরমূলার ব্যাখ্যা করতে। পরেরটাই ঘটেছে বলে ধারণা হয়।

নিখিল জানালো, সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন দিলে হয় না ?

নির্ম্মলবাবু ঠোট উল্টিয়ে বললেন,—নিরুদ্দেশ ? তা দিতে পারো, কিন্তু তাতে কি ফল হবে।

নিশীথের অভিভাবকেরা পরের দিনই এসে পড়লেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, কিন্তু নিশীথের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

চার দিন পরে অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং মেসে এসে উপস্থিত হলেন, মুখে চোখে বিরক্তির ভাব।

নিখিলকে ডেকে নিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, নিশীথ কোথায় গেছে জানো তুমি ?

তাঁর স্বরের রূঢ়তা দেখে নিখিল চমকে উঠল। তারপর ব্যাকুল হয়ে বললে, আপনি জানেন নাকি স্যার।

অধ্যাপক মশায় পরুষ কণ্ঠে বললেন, না, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি জানো অথচ বলছ না। নিশীথের অবস্থান গোপন করবার জন্য তোমাদের এই নিরুদ্দেশের অভিনয় চলছে।

নিখিল মুষড়ে গিয়ে বললে, সত্যিই আমি জানিনে স্যার।

অধ্যাপক মশায় পকেট থেকে একখানা সংবাদপত্র বের করলেন। একটা অংশ নির্দ্দেশ করে বললেন, এই নিরুদ্দেশের সংবাদ তুমিই দিয়েছ সংবাদপত্রে ?

নিখিল বললে, হ্যাঁ স্যার আমরাই দিয়েছি।

অধ্যাপক মশায় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তাহলে তুমি বলতে চাও, নিশীথের কোন সংবাদই তোমার জানা নেই, এটাও কি আমায় বিশ্বেস করতে হ'বে।

নিখিল বিনীতভাবে বললে, বিশ্বাস করুন স্যার, সত্যিই

আমি জানিনে ও কোথায় আছে। মনে হয় সে কোন গুণ্ডাদলের হাতে পড়েছে।

নিখিল আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা জানালো তাঁকে।

অধ্যাপক মশায় বিরক্ত হয়ে বললেন, এইসব আজগুবি কাহিনী আমাকে বিশ্বাস করতে বল তুমি। তোমাদের মেসে চুরি হলো আর কেউ জানলো না সেদিন সেটা। জানো তুমি নিশীথ কি করেছে ? আমার লেখা থেকে তার ফরমূলার কাগজপত্র যা ছিল সেটাতো নিয়েছেই, উপরন্তু আমার সব মূল্যবান্ কাগজপত্র পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে। এমন কি দুষ্প্রাপ্য কতকগুলো গ্রন্থ এবং আবিষ্কারের যন্ত্রও একটা চুরি করে নিয়েছে সে। সবচেয়ে দুঃখের কারণ হয়েছে আমার, ঐ দুঃস্প্রাপ্য গ্রন্থ আর আবিষ্কারের যন্ত্রটার জন্য। নিশীথ এত বড় জঘন্য চোর হয়ে উঠবে এ আমি ভাবতেও পারিনে। তুমি নিশ্চয়ই তার ঠিকানা জানো নিখিল, তার কাছ থেকে ঐ বইগুলো আর যন্ত্রটা অন্তত ফিরিয়ে দিয়ো।

নিখিল মর্ম্মাহত হয়ে বললে, আমি সত্যিই জানিনে স্যার। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, যেমন করেই হোক্ আপনার জিনিষ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করব।

অধ্যাপক মশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ব্যঙ্গ করে বললেন, থাক আর সাধু সাজতে হবে না তোমার। স্নেহের যথেষ্ট পুরস্কার পেয়েছি—যথেষ্ট! চোরের দল সব—”

তারপর হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন মেস থেকে।

চার

নিখিল বিষণ্ণ মনে বারান্দা থেকে ঘরে এসে ঢুকল। নির্ম্মল বাবু খবরের কাগজ পড়ছিলেন, নিখিলের বিষণ্ণতা জেনে কাগজ নামিয়ে রেখে বললেন, উল্টা বুঝলি রাম। নিখিল ম্লান হয়ে বললে, তুমি সব শুনেছ দাদা।

"না শুনে আর উপায় কি বলো? আলোচনা একান্তে হলেও অধ্যাপক মশায় বেশ জোরে জোরেই বলছিলেন। কাজেই গোপনীয়তা রক্ষা হয়নি মোটে। আমার সামনে এই অপ্রিয় ব্যাপারটা তিনি অবতারণা করতে চাচ্ছিলেন না। দেখছি নিশীথের উপর মর্ম্মান্তিক চটে গেছেন।" তিনি আবার কাগজে মনসংযোগ করলেন।

নিখিল উষ্মা প্রকাশ করে বললে, না চটেই বা আর উপায় কি তাঁর, এত কষ্ট লব্ধ সাধনার পরিণাম এই হবে এ তিনি ভাবতেই পারেন নি। নিশীথকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

নির্ম্মলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, সেই জন্যই আঘাত পেয়েছেন সব চেয়ে বেশী। প্রিয়জনের কাছ থেকে আঘাত এলে সেটা মর্ম্মান্তিক হয়ে পড়ে। অথচ নিশীথের এতে কোন দোষ নেই।

নিখিল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, তুমি বল কি দাদা? স্নেহের সুযোগ নিয়ে নিশীথ সব চুরি করে পালালো, এটাতো আর স্বপ্নের কথা নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ ব্যাপার। কী যে ভালবাসতেন

নিশীথকে অধ্যাপক মশায়, তা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। সেই ভালবাসার এই ভাবে প্রতিদান দেবে নিশীথ, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনে ; আর তুমি বলছ নিশীথের কোন দোষ নেই।

নির্ম্মলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর কাগজখানা কোলের উপর রেখে বললেন, এওতো হতে পারে, চুরির হাত থেকে রক্ষা করবার প্রচেষ্টায় সে নিজেই সেটা সরিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। হয়ত আঁচিলওয়ালার দৃষ্টি এসে পড়বে এর একটা আঁচ সে পেয়ে থাকবে। তাই সে নিজেই অজ্ঞাতবাস করছে।

নিখিল আশ্বস্ত হয়ে বললে, এ হতে পারে দাদা।

নির্ম্মলবাবু বলে চললেন, কোন বিষয়ের সবটা না জেনে মতামত দেওয়া চলে না। একজনের কাজের একটা দিক দেখে তার সবটা বিচার করা যায় না। মানুষকে বিচার করতে হলে তার দোষগুণের সবটুকুরই বিচার করা দরকার।

নিখিল সায় দিয়ে বললে, সে ঠিক।

নির্ম্মলবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, তবেই দেখ নিশীথকে আমরা ভালভাবে চিনেশুনেও কি একটা সাংঘাতিক ধারণা করে বসেছি তার সম্বন্ধে। আমাদের দৃষ্টিটা কতদূর একচোখে হয়ে পড়েছে দেখতে পেলে তো ?

নিখিল বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু মেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত তার ব্যবহার কি অভদ্রতাসূচক হয়েছে ?

নির্ম্মলবাবু তিক্তস্বরে বললেন, জীবন মরণের সমস্যা নিয়ে যখন তোলপাড় চলেছে তখন ভদ্রতার মাপকাঠির পরিমাণ একটু কমে এলেও ক্ষতি হবে না। একটা কথা বলে রাখছি নিখিল, নিশীথের কাজের বিচার করা আপাততঃ মুলতুবী রেখো। নিশীথকে আমি চিনি।

নিখিল চুপ করে গেল। সারাদিন ধরে অধ্যাপক মশায়ের কথাগুলি তার মনে পাক খেতে লাগল। নানারকম সংশয়ও তার মনের আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলো।

বিকালের দিকে নির্ম্মলবাবু বলে উঠলেন, চলো নিখিল তোমার সেই কলেজের পাশের রেস্তোরাঁ থেকে ঘুরে আসি। দেখি আঁচিলওয়ালার কোন আঁচ পাওয়া যায় কি না। এখানকার বন্দোবস্ত সব প্রায় ঠিক করে ফেলেছি। নিশীথের সন্ধান পেলেই দার্জ্জিলিং-এ পাড়ি দিতে হবে।

রেস্তোরাঁয় অনেকক্ষণ কাটালেন তাঁরা। বিলও শোধ দিতে হলো মোটা টাকার। কিন্তু আঁচিলওয়ালার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে রেস্তোরাঁ থেকে বের হলেন। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাস লাইটের আলো তখন তীব্র ভাবে জ্বলতে সুরু করে দিয়েছে। দুজনে হাঁটতে সুরু করে দিলেন।

ময়দানের পাশ দিয়ে যেতেই পাশ থেকে কে যেন ডেকে উঠল, এই যে নিখিল।

নিখিল চমকে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলে, পরেশ। পরেশ তার সঙ্গেই পড়ত। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে এবার পরীক্ষা দিয়েছে। নিখিল গিয়ে তার হাত চেপে ধরল। পরেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, যাক্ তবু তুই চিনতে পারলি আমায়। নিশীথটা তো চিনতেই চায় না। পরীক্ষা দিয়ে এই ক'টা দিন খুব স্ফুর্ত্তি করা—

নিখিল বাধা দিয়ে বললে, নিশীথের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল ?—কোথায়,—কখন বলতো, পরীক্ষার আগে বোধ হয় ?

পরেশ মুখ বিকৃত করে বলল,—কি যে বলিস্ নিখিল। পরীক্ষার আগে তো রোজ দেখা হতো। তখনকার নিশীথ আর এখনকার নিশীথ, ঢের তফাৎ ; স্বর্গ আর মর্ত্ত্যও বলতে—

নিখিল একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, ভূমিকা রাখ ভাই, সত্যি করে বল কোথায় দেখেছিস্। আমরা যে ওকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলুম।

পরেশ কৌতুকের সুরে বললে, হাজার হয়রান হয়েও লাভ নেই ভাই, তার নাগাল পাওয়া কঠিন। ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়ে, জিজ্ঞেস করলেও কথার উত্তর দেয় না।

নিখিল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, ফার্ষ্ট ক্লাসে,—রেলগাড়ীর ? পরেশ ব্যঙ্গের সুরে বললে, না এরোপ্লেনের। তোর যেমন কথা নিখিল ! অবশ্য এর পরে হয়ত এরোপ্লেনেই উড়বে।

নিখিল বিরক্ত হয়ে বললে, খুলেই বল না ছাই সব কথা।

নির্ম্মলবাবু এগিয়ে এলেন এই সময়ে। পরেশের দিকে তাকিয়ে কৌতূহলী হয়ে বললেন, নিশীথের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কোথায় পরেশ ?

পরেশ নির্ম্মলবাবুকে চিনতো। একটা নমস্কার করে বললে, শেয়ালদা ষ্টেশনে নির্ম্মলদা, ফার্ষ্ট ক্লাসে যাচ্ছিল। মামাও গেলেন কিনা দার্জ্জিলিং সেদিন। তাই ষ্টেশনে তুলে দেবার জন্য আমি গিয়েছিলুম। দেখলুম দার্জ্জিলিং মেলের ফার্ষ্ট ক্লাসে বসে আছে নিশীথ। অনেক প্রশ্ন করলুম তাকে, কিন্তু কি দেমাক ? কোনটারই উত্তর দিলে না সে। আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন যে কামরায়। তিনি বাহাদুরী করে আলোটাও দিলেন নিবিয়ে। ভারী রাগ হলো আমার। চলে এলুম সেখান থেকে ?

নির্ম্মলবাবু জিজ্ঞেস করলেন, নিশীথের সঙ্গে যে ভদ্রলোক দেখলে তার চেহারা কেমন বলত ? মুখে কোন আঁচিল দেখলে ?

পরেশ মাথা নেড়ে বললে, কৈ না, আঁচিলের কোন চিহ্নই নেই তাঁর। ঠোঁট দুটো বেশ পুরু। কৃষ্ণকায় বিরাট চেহারা। একটা দৈত্যবিশেষ আর কি ?

নির্ম্মলবাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন, দৈত্যই বটে !

নিখিল হতাশ হয়ে বললে, এ সেই আঁচিলওয়ালা নয় দাদা, সে ছিল বেঁটে আর ঠোট দুটো তার পাতলাই ছিল।

পরেশ অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার বলুন তো ?

নিখিল দুঃখের সঙ্গে বললে, নিশীথকে সোমবার থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

পরেশ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, পাওয়া যাচ্ছে না কি রকম, আমি সোমবার রাত্রেই যে তাকে দেখেছি !

নির্ম্মলবাবু উত্তর দিলেন, তোমার একটু বোঝবার ভুল হয়েছে পরেশ—

পরেশ বাধা দিয়ে বললে, কখ্খনো না নির্ম্মলদা, নিশীথকে আমি করবো ভুল। ওর কপালের কাটা দাগটাই যে ওর পরিচয় জানিয়ে দেয়।

নির্ম্মল বাবু বলতে লাগলেন, সে কথা বলছিনে আমি, তুমি ঠিক নিশীথকেই দেখেছো, ওর মানসিক অবস্থা ঠিক ছিল না তখন, তাই উত্তর দেয়নি তোমার কথার। ওর জন্য সারা কলকাতা আমরা তোলপাড় করছি, সংবাদপত্রেও একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

পরেশ অবাক্ হয়ে বললে, এসবের কিছুই আমি জানি নে নির্ম্মলদা, আর তাছাড়া আমি এ কয়দিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম নানান কাজে—

নির্ম্মলদা সায় দিয়ে বললেন, ঠিক তাই, নইলে সব কথা জানলে তুমি এসব কথা বলতে পারতে না। নিশীথ একটা মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়েছে। হয় ত মানসিক বিকৃতিও ঘটতে

পারে ওর। আর তা ছাড়া একটা গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েছে ও। এসব কথা তো আর রাস্তায় বলা চলে না। নিশীথ এখন কোথায় আছে এ সম্বন্ধে একটা ঠিক সংবাদ আমার জানা চাই। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কোন বিপজ্জনক কাজ করে না বসে, সেটা লক্ষ্য করতে হবে আমাদের। বড্ড দেরী হয়ে গেল দেখছি।

পরেশ উত্তর দিল, নিশীথ সম্ভবতঃ দার্জ্জিলিং গেছে নির্ম্মলদা।

নির্ম্মলদা বললেন, সম্ভব তাই, অন্ততঃ বাড়ী যায়নি সে, এটা ঠিক। অবশ্য বাড়ী থেকে তার এসেছে ক'দিন আগে। তাছাড়া তার দাদাও এসেছেন কলকাতায়। আর কোন তার এলে তিনি নিশ্চয় জানাতেন আমাদের। ভদ্রলোক অত্যন্ত স্নেহ-প্রবণ। অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন তিনি।

পরেশ বলে উঠল, চলুন না নির্ম্মলদা আমার মামার বাড়ী। মামাতো ভাই দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে এসেছে আজ। তার কাছে খবর পাওয়া যাবে নিশীথ দার্জ্জিলিং গিয়েছে কিনা? নিশীথের সঙ্গে যখন কথা বলি তখন সে উপস্থিত ছিল সেখানে।

তিনজনে পরেশের মামার বাড়ী গেলেন। নিশীথের কথা তোলা মাত্র পরেশের মামাতো ভাই বলে উঠলেন, তোমার সেই বাবুর মাথা খারাপ নাকি পরেশ? সিলিগুড়ি ষ্টেশনে মোটরে উঠবার সময় কাগজ-পত্র বগল দাবা করে ভোঁ দৌড়! ভাগ্যিস্ সঙ্গে লোকজন ছিল। অনেক কষ্টে তাকে ধরে এনে মোটরে

পুরে তবে দার্জ্জিলিং যান তারা। বহু লোক দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। পাগলের মতো তাঁর চোখ দুটো, তোমার বান্ধুর দাদা শেষে বললেন, হঠাৎ নাকি মাথা খারাপ হয়েছে তাঁর, তাই দার্জ্জিলিং-এ ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সঙ্গের এক ভদ্রলোক ছিলেন ডাক্তার। তিনি হার্ট দেখে একটা ইনজেকসন দিলেন, তবেই রক্ষে। নইলে সে দিনই হয়ে গেছল আর কি ?

পরেশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল। নির্ম্মলবাবু বাধা দিয়ে বললেন, সঙ্গে আঁচিলওয়ালা কোন লোককে দেখেছিলেন কি ?

পরেশের মামাতো ভাই তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, হাঁ হাঁ, সেই তো ডাক্তার। ইনজেকসন তিনিই দিয়েছিলেন, আর তিনি ছিলেন বলেই সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছে সে। নইলে রাস্তার মধ্যে কি দুর্ঘটনা ঘটতো ? পাগল নিয়ে রাস্তায় বেড়ানো কি সোজা কথা ! তাও আবার হার্টের রোগী, দার্জ্জিলিং-এ হার্টের রোগী নিয়ে যায় কেন তাই ভাবি।

নির্ম্মলবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে নিখিল। এখন সাড়ে সাতটা বাজে। আজই দার্জ্জিলিং রওনা হতে হবে।

পরেশের মামাতো ভাই আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, ব্যাপার কি, শুনতে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।

পরেশ উত্তর দিলে, নিশীথ খারাপ একটা দলের হাতে পড়েছে মনে হচ্ছে।

নির্ম্মলবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারলুম না। এখনই আমাদের রওনা হতে হবে দার্জ্জিলিং-এ নিশীথের খোঁজে। এর পরে যখন কলকাতায় ফিরব, তখন সবটা শুনিয়ে যাব আপনাকে। ভাল কথা, আপনি যে কয়দিন দার্জ্জিলিং-এ ছিলেন, তার মধ্যে নিশীথকে কখনো দেখেছিলেন কি? কিম্বা সেই আঁচিলওয়ালা ডাক্তার বা ঐ দিনের সঙ্গী আর কাউকে?

পরেশের মামাতো ভাই কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, কৈ না আর কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। ও হাঁ, টাইগার হিল থেকে ফেরার পথে একদিন রাস্তায় যেন দেখেছিলুম ওদের একজনকে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজন পাহাড়ীর সঙ্গে আলাপ করছিল। অবশ্য এটা আমি আন্দাজ করে বলছি। মোটর খুব স্পীডে আসছিল তখন। আমার আন্দাজ ঠিক নাও হতে পারে।

দার্জ্জিলিং সহর থেকে কতটা দূরে?

অর্দ্ধেক রাস্তায় উপরে হবে।

নির্ম্মলদা একটা নমস্কার জানিয়ে নিখিলকে সঙ্গে নিয়ে উঠলেন। পরের দিন দার্জ্জিলিং এসে গেলেন তাঁরা। সহরের পথঘাট লোকজন অনেক তাঁর পরিচিত। ক'দিন ধরে পাতি পাতি করে খুঁজলেন তাঁরা নিশীথকে, কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

নির্ম্মলবাবু শেষে আফিমের চোরাই কারবারীদের সন্ধানে লেগে গেলেন। অনেক চেষ্টার পর জানলেন, আফিম-ওয়ালাদের একটা আড্ডা আছে দুর্গম হিমালয় অঞ্চলে। কোন রাজত্বের মধ্যে নাকি সে স্থান আসে না। পথ মোটেই নাই। থাকলেও এমনি দুর্গম যে, সেখানে যাওয়ার কল্পনা করাই নাকি বাতুলতা। পৌঁছানো দূরের কথা, সেখানে যেতেই হয় শীতে নয় তুষার ঝড়ে অক্কা পেতে হ'বে। পাহাড়ে উঠা অভ্যাস না থাকলে সেটা পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘনের মতই হবে। দার্জ্জিলিং থেকে বহুদূর হিমালয়ের অত্যুঙ্গ শৃঙ্গের কোন এক পর্ব্বত-কন্দরে তাদের এই আস্তানা।

নির্ম্মলবাবু সব সংবাদ জেনে এসে বললেন, তুমি বাসায় অপেক্ষা করো নিখিল, আমি হিমালয়-সমুদ্রে পাড়ি দেব ঠিক করছি।

নিখিল সব জেনে বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব দাদা।

নির্ম্মলবাবু হেসে বললেন, তুমি গেলে রাস্তার বিপদে যদি প্রাণ হারাই তাহলে কি হবে বলো দেখি? পিতৃ-পুরুষের জলপিণ্ড দেবে কে?

নিখিল হেসে বললে, সে হয় না দাদা, তুমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছ, আর আমি হিমালয় পাহাড়টা দেখতে পাবো না। এ হচ্ছে না, আমি তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই রওনা হবো।

নির্ম্মলদা পিঠ চাপড়ে বললেন, এই তো মরদের মত কথা।

বিপদ দেখে ভয় পেলে চলবে কেন ? তবে পথটার বিবরণ তো শুনলে। এ হচ্ছে নগাধিরাজ। দুর্গম এর অধিরোহণ—

নিখিল জেদ ধরে বসল, তা হোক্ আমি যাবো।

নির্ম্মল বাবু বললেন, বেশ।

পরের দিন পাহাড়ে উঠার সরঞ্জাম আর কয়েকজন বিশ্বস্ত পাহাড়ী নিয়ে নির্ম্মলদা পাড়ি দিলেন অজানা পথে। মাঝ পথে সুরু হলো প্রবল বৃষ্টি আর কন্‌কনে শীতের হাওয়া। তীরের মতো সেগুলো ওয়াটার প্রুফ ভেদ করে গায়ে লাগছিল। সামনে তাদের দুর্গম পথ। এই বিপদ-সঙ্কুল পথে এগিয়ে যেতে হবে তাদের অনেক দূর। তারপর তারা নিশীথের সন্ধান পাবেন কি না কে জানে ? এখন বরফ গলার সময়। পাহাড়ে উঠায় পদে পদে বিপদ আছে। তুষার ঝড় আর বৃষ্টি বাদল মাথায় নিয়ে দুজনে অজানা পথে পাড়ি দিলেন। হিমালয় যেন প্রকৃতির রুদ্ররূপের বরণ-ডালা নিয়ে তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। নিশীথের সন্ধান তারা নাও পেতে পারেন, কিন্তু এই যে মধুর অভিযান, সুন্দর প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্মবিলোপন—এই অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে বৈ কি ? বৃষ্টি-সিক্ত অবস্থায় সেই দারুণ শৈত্যের মধ্যেও নিখিল প্রকৃতির এই মধুর রূপ দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। সামনে রয়েছে তাদের বিপদের তাণ্ডব নর্ত্তন, কিন্তু তার জন্যে একটু রেখাপাতও হলোনা তাদের মনে। আঁকা বাঁকা পথে পাহাড়ের

পর পাহাড় ভেদ করে চললো হিমালয়ের স্নেহ-শীতল নীড়ে। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ মাঝে মাঝে মেঘ কবল মুক্ত হয়ে তাদের মনে তৃপ্তির আভাস জাগিয়ে তুলছিল।

পাঁচ

নিশীথের যখন জ্ঞান হলো, তখন সে দেখতে পেলে, সে যেন একটা স্বল্পালোকিত ঘরে শুয়ে রয়েছে। তাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকজন, এদের কাউকেই সে চিনতে পারল না। সমস্ত শরীরটা যেন তার অবশ হয়ে এসেছে। সমস্ত দেহ মনে একটা ক্লান্তির ও গ্লানির আভাস জুড়ে রয়েছে, চোখ বুজে আবার পাশ ফিরে শুয়ে রইল সে।

কি করে সে এই অজানা স্থানে এসে পৌঁছল, সেটা তার দুর্ব্বল মন যেন আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারছিল না। তার মনে হতে লাগল, সে যেন খুব কঠিন অসুখে পড়েছে। সমস্ত শরীর তার শীতে যেন আড়ষ্ট হয়ে আসছে। পর পর কয়েকটা কম্বল মুড়ি দিয়েও তার সে শীত যেন আর থামছে না। নানারকম এলোমেলো চিন্তা তার মনে জাগছিল। অনেক চিন্তার পর পূর্ব্ব স্মৃতির খানিকটা তার মনে আসছিল,—মনের অবচেতন অংশ থেকে; কিন্তু পরক্ষণেই পরস্পরের সামঞ্জস্য

হারিয়ে মনের অতল তলে আবার ডুবে যাচ্ছিল। কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব তার মুখে ফুটে উঠছিল।

হঠাৎ তার মনে হল, কে যেন তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। নিশীথ চোখ মেলে চাইল। একজন বিরাট দেহী লোক দাঁড়িয়ে ছিল তার বিছানার পাশে।

নিশীথ বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে দেখলে, এই সেই লোকটি, যে তাদের কলেজের গেটের পাশে দাঁড়িয়েছিল। যে কলেজের ল্যাবরেটারী থেকে বের হবার সময়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কী ভীষণ ছিল তখন তার চোখ দুটো। অজগর সাপের মত দীপ্তি ছিল সে চোখে। নীতিশের খুড়ো বসেছিল সেই মোটরে, এটা তার বেশ মনে পড়ছে। কী প্রকাণ্ড দেহ এই লোকটির! প্রকাণ্ড হাতে দুজনাকে চোখের সামনে দোলাচ্ছিল। তারপরে কি হলো এটা তার স্পষ্ট মনে পড়ছে না। তাইত! এরা তাকে কোথায় এনে রেখেছে? এত শীত কেন এখানে? মাটির নীচেই সে এখন রয়েছে না কি? নিশীথের চোখ দুটো নিমীলিত হয়ে এলো।

সমস্ত জিনিষগুলো তার এখন স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। বুঝতে পারলে, সে এখন একটা দুর্ব্বৃত্তদলের হাতে পড়েছে। এদের উদ্দেশ্য কি সেটা সম্যক বুঝতে না পারলেও এটা তার মনে হল, ফরমূলার ব্যাখ্যা বুঝে নেবার জন্যই এরা তাকে বন্দী করে এনেছে। কলকাত্যয় একদল গুণ্ডা রয়েছে, তারা

নাকি ছোট ছোট ছেলেদের ধরে এনে অন্ধ করে ভিখারী করে নেয়। তারপর তারা তার আয়ের অংশ গ্রহণ করে। এরা তারা নয় ত? সে তো ছোটছেলে নয়? তাকে নিয়ে করবে কি? অন্ধ হবার কল্পনা করে সে একটা অস্ফুট চীৎকার করে চোখ মেলে চাইল।

বিরাটদেহী লোকটা তখনও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। নিশীথ তাকে দেখতে পেয়েই চীৎকার করে বলে উঠল, চলে যাও, চলে যাও তুমি এখান থেকে। তোমার মুখ দেখতে চাইনে আমি। দূর হও আমার সামনে থেকে। উত্তেজনার আবেশে নিশীথ হাঁপাতে সুরু করে দিলে।

লোকটা দ্বিরুক্তি না করে সেখান থেকে চলে গেল। তারপরই আর একজন লোক এগিয়ে এলো তার সামনে। নিশীথ তাকে চিনলে, এ সেই আঁচিলওয়ালা লোকটা। রূঢ়কণ্ঠে সে বলল, এই জন্যই বোধহয় রেস্তোরাঁ থেকে আমার পেছু নিয়েছিলে। ফিরিয়ে দাও আমার কাগজপত্র, ফরমূলা সব। চোর কোথাকার!

পকেট থেকে কতকগুলো কাগজপত্র বের করে সে নিশীথের সামনে দিয়ে বলল, অনর্থক চটে লাভ কি নিশীথবাবু! এই নিন আপনার কাগজপত্র, ফরমূলা—দেরাজ থেকে যা নিয়েছিলুম, ফেরৎ দিলুম।

নিশীথ কাগজগুলো খুলে নিয়ে ভাল করে দেখে নিলে, সব ঠিক আছে। একখানা কাগজও হারায়নি। অত্যন্ত পরুষ কণ্ঠে

সে বললে, কেন নিয়েছিলে তুমি আমার ফরমূলাগুলো চুরি করে? তুমি এ ফরমূলার কি বুঝবে? শুধু শুধু হয়রানি করবার জন্য কেন আমায় চুরি করে এখানে নিয়ে এলে? আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন স্থবিধা হবে না, এ আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

নিশীথ ফরমূলা নিয়ে গভীরভাবে তাতে মনোনিবেশ করলে। কলেজের ল্যাবরেটারীতে যে সব বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেনি, ফরমূলাগুলোয় চোখ বুলিয়ে সেগুলো প্রাঞ্জল হয়ে উঠল। এই দারুণ বিপদের মুখেও তার মুখ আবিষ্কারের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এ যেন হৃত ধন পুনরুদ্ধারের চেয়েও তাকে অনেক বেশী আনন্দ দিল। তার গবেষণার প্রত্যেকটি জিনিষই যেন তার চোখে ভাসতে লাগল। আবিষ্কারের আনন্দ যে কী মধুর, কি স্থন্দর ও তৃপ্তিদায়ক, তা আজ সে স্পষ্টরূপে বুঝতে পারল। তার মনে হলো, কেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস সূত্র পেয়ে স্নানের টব থেকে সিক্ত অবস্থায়, 'আমি পেয়েছি' বলে চীৎকার করে ছুটে বেরিয়েছিলেন।

এমনি সময়ে কদাকার একটা লোক এক কাপ দুধ এনে নিখিলের সামনে রেখে দিল। তার চেহারা দেখেই নিশীথের মন ঘৃণায় ভরে গেল। কাপটা সে দূরে সরিয়ে রেখে দিল।

আঁচিলওয়ালা বলল, দুধটুকু খেয়ে ফেলুন নিশীথবাবু; বড় দুর্ব্বল আছেন আপনি, এইটুকু খেয়ে ফেললে দুর্ব্বলতা কমে যাবে আপনার।

নিশীথ দৃঢ়স্বরে বললে, না দুধের আমার প্রয়োজন নেই। আর তাছাড়া ঐটুকু দুধে আমার কিছুই হবে না। এখন কিছুই আমি খাব না।

আঁচিলওয়ালা একটু হেসে বললে, এরচেয়ে বেশী দুধ খাবার শক্তিই নেই এখন আপনার। দশ দিন অজ্ঞান ছিলেন আপনি, এটা আপনার জানা নেই বলেই আরো দুধ চাইছেন আপনি। এ ক'টা দিন শুধু তরল পদার্থের উপরই আপনার দিন কেটেছে।
নিশীথ চোখ কপালে তুলে বললে, দশ দিন? একটু মনে পড়ছে যেন, সিলিগুড়ি ষ্টেশনে এসেছিলুম আমি। সেখানে জোর করে আমায় একটা ইনজেকসন দেওয়া হয়। আমি কি এখন সিলিগুড়িতেই আছি?

আঁচিলওয়ালা কঠিনকণ্ঠে বললে, না, আপনার ঐ বেয়াদবির ফলে আমাদের যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। দশ দিন ধরে আপনাকে বহন করে আনতে হয়েছে হিমালয়ের এই নিভৃততম দুর্গম অংশে। এখান থেকে বের হবার কোন উপায় নেই আপনার। আমরা ছেড়ে দিলেও আপনি যেতে পারবেন না। কেননা পথ বলে বিশেষ কিছুই নেই। আর তাছাড়া এস্থানটার বিশেষত্বই এই যে, ছেড়ে দিলেও ঘুরে এখানেই ফিরে আসবেন। এ গোলক ধাঁধার পথ চিনে বেরোবার উপায় আপনার নেই। বিশ্বাস না হয় সুস্থ হয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখবেন। এখন ভাল ছেলের মত আমরা যা বলি নির্বিবাদে তাই করে যাবেন। নইলে

আপনার পরিণাম যা হবে নিজেই বেশ বুঝতে পারছেন। যাক্ এসব আলোচনা করে কোন লাভ নেই। দুধটুকু খেয়ে ফেলুন। কথা না শুনলে আপনাকে আবার হয় তো অজ্ঞান করা হবে।

নিশীথ দ্বিরুক্তি না করে দুধের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিতে লাগল। তারপর কাপ নামিয়ে রেখে বলল, নীতিশের কাকাও কি এখানে এসেছেন নাকি? মোটরে ওঠার সময় তাঁকে দেখেছিলুম মনে হচ্ছে। তিনিও কি আমার মত বন্দী হয়েছেন।

আঁচিলওয়ালা হেসে বলল, তিনিও এখানে আছেন। তার পরিচয় যথাসময়ে আপনি পাবেন। এখন ব্যস্ত হয়ে লাভ কি?

নিশীথ দৃঢ়স্বরে বললে না, তাঁকে আমার কাছে এনে দিন। অকারণে একজন ভদ্রলোককে হয়রানি করবার প্রবৃত্তি হল কেন বুঝতে পারিনে।

আঁচিলওয়ালার মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু থেমে বললে, সেদিন আপনার ছুটে পালাবার চেষ্টা দেখে মনে হয়েছিল নীতিশের খুড়োকে আপনি চিনে ফেলেছেন, এখন দেখছি সে ভাবান্তর অন্য কারণে। আপনার বন্ধু নিখিল অবশ্য তাঁকে চিনেছে। অবশ্য এখন আর তাঁর পরিচয় দিতে আপত্তি নেই। নীতিশের খুড়ো এখনই আপনার কাছে আসবে। মুখ ফিরিয়ে পকেট থেকে একটা কাপড়ের পটী বের করে আঁচিল ঢেকে

একটু বিকৃত মুখমণ্ডল সৃষ্টি করে সে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, চিনতে পারছেন ?

নিশীথ অস্ফুটস্বরে বললে। কি সর্ব্বনাশ !

আঁচিলওয়ালা হাসতে হাসতে দলবল সহ বের হয়ে গেল।

নিশীথের মনে দুশ্চিন্তার ছায়া নামতে লাগল। ভাল করে চারিদিকে চেয়ে সে দেখল, যে ঘরে তাকে রাখা হয়েছে সে একটা গুহা বিশেষ, গুহাটার আয়তন ছোট কিন্তু সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। ভেতর থেকে দেখলে প্রথমটা একটা ঘরের মতন মনে হয়। ঘরটা সাজানোর ফলেই যে এই দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে এটা সে বুঝতে পারল। পাশাপাশি আরো অনেকগুলো এই রকম গুহা রয়েছে দেখে সে অবাক্ হয়ে গেল, হিমালয়ের কোথায় যে এসে পড়েছে এটা সে জানে না। কিন্তু দশ দিন ধরে তাকে বহন করে আনতে হয়েছে এদের এই কথা থেকেই সে দূরত্বটা অনেকটা অনুভব করলে। যা শীত এখানে! পরপর কয়েকটা কম্বল দিয়েও শীত যেন কিছুতেই যাচ্ছে না তার। দরজার ফাঁক দিয়ে সাদা পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সে যে তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ে এসে পড়েছে, এ সম্বন্ধে তার সন্দেহ রইল না। এই দুর্গম পাহাড়ের জনহীন অঞ্চলে এই গুহাই বা তারা আবিষ্কার করলে কি ভাবে, আর এই গুহাতেই তাকে টেনে আনা হলো কি জন্য, এইসব বিষয় চিন্তা করে কোন কূলকিনারা না পেয়ে অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আরো চার পাঁচ দিন কাটল এইভাবে। সে ভাল হয়ে উঠেছে, দুর্ব্বলতার ঘোর তার কেটে গেছে। কিন্তু তার কর্ম্মময় জীবন শীতের আড়ষ্টে আর নিশ্চেষ্টতায় ব্যাহত হয়ে সর্ব্বদাই একটা বিরক্তির ভাব জাগিয়ে তুলছিল। ক'দিন থেকেই বাইরে যেন তুষার ঝড় চলছে। কন্‌কনে হাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য গুহার মুখটায় একটা বড় পাথর বসানো হয়েছে। গুহার ভেতরটায় জ্বলছে গনগনে আগুন। কিন্তু শীতের মাত্রা এতই বেশী যে, সে আগুনের ক্রিয়াও সম্যক অনুভব করা যাচ্ছে না। নিশীথ জড়তা দূর করবার জন্য ডন-বৈঠক সুরু করে দিল গুহার মধ্যে। কিন্তু প্রায় সময়েই তাকে কম্বল জড়িয়ে থাকতে হতো শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য। একটা শ্বাস কষ্ট যেন দেখা দিতে লাগল। কিন্তু সেটা গুহার আগুনের জন্য কি পর্ব্বতের উচ্চতার জন্য, তা সে ঠিক বুঝতে পারল না। একবার বাইরে বেরোতে পারলে হয়ত এ প্রশ্নের সমাধান হতে পারে, কিন্তু তার উপায় তো আর নেই। তুষার ঝড়টার প্রকৃতি দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল তার, কিন্তু পাথরটা সরাবার কোন উপায় নেই। এক জগদ্দল পাষাণ চেপে রয়েছে তার উপর।

একটা অক্সিজেন সিলিণ্ডার রাখা হয়েছে তার গুহাঘরে। শ্বাস কষ্ট দূর করবার জন্য মাঝে মাঝে অক্সিজেন টেনে নিতে হতো তার। অন্যান্য গুহাঘরে কি আছে দেখবার একটা অদম্য কৌতূহলও তার মনে জেগে উঠতে লাগল। কিন্তু তারও

উপায় নেই। কতদিন যে তাকে এমন বন্দীভাবে রাখবে কে জানে!

পরের দিন সকালে হঠাৎ তার ডাক পড়ল। দলের কর্ত্তা এসেছেন, তার কাছে হাজির হতে হবে নিশীথের। কম্বলটা ভালভাবে জড়িয়ে নিয়ে নিশীথ ওদের সর্দ্দারের কাছে হাজির হল।

এ গুহাটা আরো চমৎকার ভাবে সাজানো। গুহার পাথরগুলি কাপড় দিয়ে ঢেকে যেন একটা প্রাসাদ তৈরী করা হয়েছে। নীচে পুরু গালিচা পাতা রয়েছে। ইলেকট্রিক ব্যাটারীর সাহায্যে বালবগুলো জ্বলছে। হঠাৎ ঢুকলে মনে হয় কলকাতা সহরের একটা ভাল সাজানো ঘরে ঢুকে পড়া গেছে।

সর্দ্দারের মুখে কালো রবারের মুখোস। ইলেকট্রিকের আলোয় সেটা অতি বীভৎস দেখাতে লাগলো। সমস্ত শরীর তার পুরু কম্বলে ঢাকা রয়েছে। গলার কাছে টাই দেখে নিশীথের ধারণা হলো, সর্দ্দার সাহেবী-পোষাক পরে রয়েছে। তার মনে হলো, সে যেন নরকের রাজত্বে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন হয়ত তার বিচার হবে পাশবিক আইনের সাহায্যে। ঘৃণায় ও ভয়ে তার শরীরটা যেন রি রি করতে লাগল।

নিশীথ এগিয়ে সর্দ্দারের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তার দু'পাশে কদাকার দুই সশস্ত্র লোক দাঁড়িয়ে রইল। একটা

কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যে সে এসে পড়েছে, এটা নিশীথ বুঝতে পারল। মনকে দৃঢ় করে চুপ করে সে বসে রইল।

সর্দ্দার কি যেন কাগজপত্র দেখছিল। কিছুক্ষণ পরে নিশীথের দিকে ফিরে পরুষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, তোমাকে কি জন্য আনা হয়েছে, এরা বলেছে ?

কী ভীষণ গলা ! নিশীথ চমকে উঠে পরক্ষণেই সে ভাব সামলে দৃঢ়স্বরে বললে, না।

সর্দ্দার ধমক দিয়ে বলল, উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দাও।

আঁচিলওয়ালা নিশীথের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সর্দ্দারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেও বলে উঠল, দাঁড়িয়ে উত্তর দাও।

নিশীথ একটা ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চুপ করে বসে রইল।

প্রহরী দুটোর অস্ত্র ঝনঝনিয়ে উঠল। উন্মুক্ত কৃপাণ নিয়ে তারা সর্দ্দারের আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

নিশীথ কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করল না। তার এই নির্ভীকতা দেখে সর্দ্দার একটু অবাক্ হলো। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, তোমার এই অবাধ্যতার কারণ কি ? আমার সামনে অবাধ্যতা প্রকাশ করলে তার শাস্তি কি এরা কি তোমাকে বলে দেয় নি।

নিশীথ বিকৃতভাবে জবাব দিল, দিয়েছে।

সর্দ্দার যেন ফেটে পড়লো,—তবে ?—তবে ? কেন এই অবাধ্যত্যা প্রকাশ করতে তোমার সাহস হলো ?

নিশীথ দৃঢ় কণ্ঠে জানালো, বৈজ্ঞানিকদের সম্মান রেখে কথা বলতে যারা জানে না, তাদের সঙ্গে কথা বলতে আমি ঘৃণা বোধ করি ?

উন্মুক্ত কৃপাণ নিয়ে প্রহরী দুটো আরো এগিয়ে এলো। একটুখানি ইঙ্গিতের অপেক্ষা মাত্র ; তারপরই এই গুহাঘর তরুণ বৈজ্ঞানিকের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠবে। সমস্ত গুহাঘর নিস্তব্ধ হয়ে উঠল। যেন একটা সূচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও আবহাওয়া যেন এই নিস্তব্ধতাকে আরো বিভীষিকাময় করে তুলছিল।

সর্দ্দার হাত তুলে নিষেধ জানালো। প্রহরীদের কৃপাণ আবার কোষবদ্ধ হ'লো। সর্দ্দার আবার কাগজপত্রে মন দিল।

একটু পরে সে বললে, তুমি এখনও ছেলে মানুষ ; বিশেষতঃ আমার সঙ্গে তোমার এই প্রথম পরিচয়। কিছুদিন এখানে থাকলেই তুমি বুঝতে পারবে আমার অবাধ্য হবার পরিণাম কি। বৈজ্ঞানিকদের কি সম্মান দিতে হয়, সে উপদেশ দেবার অবশ্যকতা তখন আর তোমার হবে না।

নিশীথ চুপ করে রইল।

সর্দ্দার বলে যেতে লাগল, তোমাকে আনা হয়েছে আমাদের কাজের সাহায্যের জন্য। আমরা আফিম চালানোর ব্যবসা করে থাকি। কিন্তু তাতে তোমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। আমাদের তোমায় প্রয়োজন হবে এক নব অভিযানে

সাহায্য করতে। আমি শুনেছি তুমি রংএর প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে সফলকাম হয়েছ। অনেকদিন হল তোমার উপর আমাদের লোক লক্ষ্য রেখেছিল। শুধু ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাদের। আমাদের আর একজন বৈজ্ঞানিক আছে, তোমাকে শুধু তার কাজে সাহায্য করতে হবে। তোমার ফরমূলার অর্থ আমরা বুঝতে পারি নি, তাই তোমাকে আনা হয়েছে।

নিশীথের মুখে হাসি ফুটল। বিদ্রূপের স্বরে সে বলল, আমার ফরমূলার অর্থ বোঝা, যার তার কর্ম্ম নয়। আমাকে কি সেই ফরমূলার অর্থ বোঝানোর জন্যই এখানে আনা হয়েছে?

সর্দ্দার তার সেই ব্যঙ্গের সুরে ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিলে, না মূর্খ, সেজন্য তোমাকে আনা হয় নি। তোমাকে আনা হয়েছে আমাদের ল্যাবরেটারীতে কাজ করবার জন্য। এ পাহাড়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব সুন্দর করে আমরা ল্যাবরেটারী তৈরী করেছি। যা তোমার আবশ্যক হবে সেখানেই পাবে। নতুন কিছু আবশ্যক হলেও আমরা সেগুলো সরবরাহের চেষ্টা করবো। আমরা নোট তৈরী করছি। নোটের রংটা যাতে ঠিক হয়, সেইটে লক্ষ্য করতে হবে তোমাকে।

নিশীথ সবিস্ময়ে বললে, নোট,—জাল নোট?

সর্দ্দার বিরক্তিভরে বললে, অত খোঁজে তোমার দরকার কি? তুমি শুধু আমাদের হুকুম মেনে চলবে। তোমার ফরমূলাগুলো

তোমায় ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। এই নাও তোমার প্রফেসারের কাগজপত্র। যদি এর কোন আবশ্যক থাকে।

সর্দ্দার টেবিল থেকে কতকগুলো কাগজপত্র নিশীথের হাতে তুলে দিল। নিশীথ কাগজগুলো হাতে নিয়ে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললে, এ কাগজ এখানে এলো কি করে? এ যে অধ্যাপক মশায়ের গবেষণার কাগজ! এর দু'টি একটি ছাড়া আর কিছুই কাজে লাগবে না। এতো অন্য বিষয় নিয়ে গবেষণা!

সর্দ্দার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কোনটা তোমার কাজে লাগবে তুমিই সেটা বুঝতে পারবে। এ কাগজগুলো তুমিই চুরি করে এনেছো।

নিশীথ প্রতিবাদ করে উঠলো, আমিই চুরি করে এনেছি? —মিথ্যা কথা।

প্রহরীরা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। সর্দ্দার বলে যেতে লাগলো, তুমি অবশ্য সেটা জান না। সম্মোহনের প্রভাবে তুমিই সেটা করেছ। শুধু এই নয়, তোমার নিজের সব বিজ্ঞানের বইও এনেছ। ল্যাবরেটারীর টেবিলে সেগুলোও পাবে। যাক্ কথা বলবার সময় এখন আমার খুব কম। তোমায় একমাস সময় দিলুম। এই এক মাসের মধ্যে নোট যেন বাজারে ছাড়া যায়, তোমায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে তার পরিণাম কি হবে এরাই বলে দেবে সে-সব কথা।

নিশীথ দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, পরিণামের ফলাফলটা এখনই

হয়ে যাক্। বৈজ্ঞানিকের আদর্শ থেকে আমি চ্যুত হতে পারবো না। মৃত্যুর ভয় করে আর লাভ কি? সে তো একদিন আসবেই। আমি নোট জাল করার মত ঘৃণ্য কাজে সাহায্য করতে পারবো না।

সর্দ্দার উঠে দাঁড়ালো। রাগে তার সমস্ত শরীরটা ফুলে উঠল। রবারের মুখোস ভেদ করে চোখ দুটো বের হয়ে এলো। ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে আদেশ দিল, একে ঠাণ্ডা ঘরে নিয়ে যাও।

নিশীথকে আর একটা গুহা-ঘরে নিয়ে আসা হল। সেটা ল্যাবরেটারীর আর একটা অংশ। আঁচিলওয়ালা লোকটি সঙ্গে এসেছিল। একটা টেবিলে কতকগুলো কাঁচের পাত্র ছিল। আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল. ঐ দেখুন আবাধ্যতার পরিণাম!

সারি সারি কাটা মুণ্ড সাজানো রয়েছে কাঁচের পাত্রগুলিতে। কী বীভৎস তাদের মুখ!

নিশীথ জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় পড়ে গেল।

ছয়

নিশীথ বিছানায় উঠে বসল। কঠিন প্রস্তরের উপর একটা কম্বল বিছিয়ে তার শয্যা রচনা করা হয়েছে। এই দারুণ শীতের মধ্যে মাত্র দুখানি কম্বল সম্বল করে রাত কাটাতে হয়েছে তার। অন্ধকারময় একটা গুহায় এনে রাখা হয়েছে তাকে।

কাল সারা রাত অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে কেটে গেছে তার। আজও যে তাকে সহজে ছেড়ে দেবে, তা তার মনে হলো না।

এই গুহাটা যেন ভূগর্ভে রয়েছে। সম্ভবতঃ এটা তাদের বন্দী রাখবার ঘর। ঠাণ্ডা ঘরেরই অন্য একটা সংস্করণ, এখানে অবশ্য কাটা মুণ্ডের বিভীষিকা নেই।

সমস্ত গুহাটাই যেন এক অন্ধকারের রাজত্ব। গুহার দরজা রয়েছে উপরে—হাতের নাগালের বাইরে। একটা ভারী পাথর দিয়ে চাপা রয়েছে তার মুখ। তারই ফাঁক দিয়ে বাইরের প্রভাতী আলোকের ক্ষীণ-রশ্মি এসে গুহায় প্রবেশ করেছিল। সেই স্বল্পালোকে নিশীথ এই অপরিসর গুহার ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখতে পেলে। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চারিদিকে ইতস্ততঃ প্রস্তর পড়ে রয়েছে। উপরের পাথরগুলো এমনি ভাবে ঝুলছে যে, দেখে মনে হয়, যে-কোন মুহূর্ত্তে সেগুলো ধ্বসে পড়ে তাকে চূরমার করে দেবে। পাথরগুলো অনেক ভারী। এক-একটাই হয়তো ওজনে কয়েক মণ হবে। গুহার চেহারা দেখে অনেকদিন এখানে মানুষ বাস করেছে বলে মনে হল না। একটা বিশ্রী গন্ধ যেন সমস্ত গুহটা জুড়ে রয়েছে। নিশীথের বমির ভাব হতে লাগল। প্রবল শীতে গুহাটা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আগুন জ্বালবার কোন ব্যবস্থাই নেই। সে গুহা এতই অপরিসর যে, আগুন জ্বালবার ব্যবস্থা করলে হয়ত অক্সিজেনের অভাবেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। পাতলা বাতাসে সে অক্সিজেনের অভাব অনুভব

করলে। এমনি ভাবে বন্দী থাকলে তাকে বেশীদিন বেঁচে থাকতে হবে না। কষ্টে তার চোখে জল এসে গেল।

কাল দিন রাত তার খাওয়া হয় নি। এরাও তাকে খাবার দেবার আবশ্যকতা অনুভব করে নি। হয়ত তাকে খেতে না দিয়েই তিলে তিলে মারবে। এদের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। কাটা মুণ্ডের সারি তার জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এ শুধু যে কাজের নিষ্ঠুরতারই পরিচায়ক, তাই নয়; সমস্ত দল যাতে নির্ব্বিবাদে সর্দ্দারকে মেনে চলে তারই একটা ভয়ের প্রতীক। নিশীথ বুঝতে পারলে, এই দুর্গম অঞ্চলে এই বিপজ্জনক কাজের জন্য তারা যে-কোন নিষ্ঠুরতাকেই বরণ করতে কোন দ্বিধা বোধ করবে না।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে সে কি বলে! এই জঘন্য কাজে সে কখনও যোগ দেবে না। এতে যদি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবেও তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়, তা সে মাথা পেতে বরণ করে নেবে। সব রকম বিপদপাতের জন্য তৈরী হয়ে মনকে সে দৃঢ় করে ফেলল।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকিত হয়ে সে তাকিয়ে দেখল, গুহার মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে টর্চ্চের একটা তীব্র আলো এসে তার মুখের উপর পড়ল। নিশীথ অত্যন্ত বিরক্তি-ভরে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু সে লোকটা টর্চ্চের আলো নিবিয়ে ফেললে না।

অনেকক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে থেকে হঠাৎ এই টর্চের আলোয় নিশীথের চোখ যেন ঝল্‌সে গেল। ভাল করে চোখ রগড়ে উপরের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেলে, সেই আঁচিলওয়ালা লোকটা টর্চের আলো ফেলে তাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছে। ঘৃণায় নিশীথ আবার মুখ ফেরালে। আঁচিলওয়ালা তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞেস করলে, কিছু খেতে চাস্।

উক্তির ধরণ দেখে নিশীথ রাগে দাঁত কড়মড় করতে লাগল। এই হীন লোকটা তার অসহায়তার চূড়ান্ত সুযোগ নিচ্ছে। কোন কথার জবাবই দিল না সে।

একটু পরে দু'টুকরো রুটি তার সামনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল :—যেন ডাষ্টবিনে উচ্ছিষ্ট খাবার ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুধায় সমস্ত শরীর ক্লান্ত হয়েছে। নিশীথ দাঁতে দাঁত চেপে রইল। এ অশ্রদ্ধার দান সে কখনও নেবে না।

কিন্তু এই বন্দী অবস্থায় এই দুর্গম অঞ্চলে তাকে শ্রদ্ধা করতেই বা আসবে কে? ক্ষুধার তাড়না প্রবল হয়ে দেখা দিলে তার। আহারে সে বিশেষ পটু। কিন্তু এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে সে আহার তাকে কে জোগাবে? অনেক ভেবে চিন্তে সে রুটী দুখানা তুলে নিল। বিশ্বের বুভুক্ষা যেন তার শরীর জুড়ে দেখা দিয়েছে। রুটি ছিড়ে সে মুখে পুরে দেবার চেষ্টা করলে। তারপর থু' থু' করে ফেলে দিলে। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত রুটি, মানুষ দূরের কথা একটা সাধারণ কুকুরও

তার গন্ধ পেয়ে পালিয়ে যাবে। নিশীথ নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

গুহার মুখে আবার মানুষের পদশব্দ শোনা গেল। কে যেন একটা মই নামিয়ে দিল গুহার মুখ থেকে। তারপর টর্চ্চের আলো জ্বলে উঠল। নিশীথ দেখতে পেলে পরপর কয়েকজন লোক সেই মই বেয়ে গুহার মধ্যে নেমে এল। তাদের পুরোভাগে রয়েছে সেই আঁচিলওয়ালা সর্ব্বনেশে লোকটা।

নিশীথ তেমনি ভাবে চুপ করে বসে রইল।

আঁচিলওয়ালা বিদ্রূপ করে বললে, কি গো নবাব তেজ কমেছে কিছু এখন ?

নিশীথ একটা ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি তার সর্ব্বাঙ্গ বুলিয়ে নিল।

আঁচিলওয়ালা খলখল করে পিশাচের মত হেসে উঠে বলল, সয়তানের ভঙ্গী দেখ ? চোখ দিয়ে যেন গিলে খেতে চায়। এখনই কি হয়েছে ? গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেব, এত বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোর যে, সর্দ্দারের সামনে কি করে কথা বলতে হয় তাও জানিস্ না ?

নিশীথ পিছন ফিরে বসে রইল। আঁচিলওয়ালা পিঠে একটা গুঁতো দিয়ে বললে, আমার কথা কানে যাচ্ছে না তোর !

নিশীথ পিছন ফিরে উত্তর দিল, কুকুরের চেয়েও হীন যারা, তাদের কথার কোন জবাব দেওয়ার আমি আবশ্যকতা মনে করিনে।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল আঁচিলওয়ালা। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠল, করাচ্ছি মনে ভাল করে। আমায় কুকুর বলিস্ তুই! ভালকথা, কুকুরের কামড় কেমন লাগে তাই ছাখ!

আঁচিলওয়ালার ইঙ্গিতে দুজন প্রহরী এসে নিশীথের পাশে দাঁড়ালো। আঁচিলওয়ালা আদেশ করল, তুলে ধর এটাকে?

অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নিশীথকে টেনে তুললে তারা। নিশীথ রাগে অপমানে থরথর করে কাঁপতে লাগল,। রুদ্ধকণ্ঠে সে বলল, কি করবে তোমরা আমায়,—মেরে ফেলবে? তাই কর, ল্যাঠা চুকে যাক। দলবেঁধে আসা হয়েছে! সাহস থাকে তো এগিয়ে এসে লড়ো আমার সঙ্গে। তবেই বুঝব বীর। নিরস্ত্র একটা লোকের উপর দলবেঁধে এসেছো অত্যাচার করতে। লজ্জা করে না তোমাদের

কিন্তু বেশী কথা বলবার সুযোগ পেলে না সে। ভীমাকার প্রহরী দুটো তাকে দড়ি দিয়ে কঠিন ভাবে বেঁধে ফেলল। নিশীথ বিদ্রূপ করে বললে, নাও এবার বাহাদুরী ফলাও, দেখি তোমাদের কুকুরের কামড়ের দৌড়ই বা কতদূর

আঁচিলওয়ালা একটা চাবুক বের করল। তারপর নিশীথের দিকে তাকিয়ে বলল, এখনও বল আমাদের কথা মেনে সব কাজ করবি কি না?

নিশীথ দাঁতে ঠোট চেপে রইল, কিন্তু কোন জবাব দিল না।

আঁচিলওয়ালা একটা চাবুক কসে দিল। চামড়া কেটে তার

গায়ে বসে গেল সে চাবুক। একটা অসহ্য যন্ত্রণায় তার শরীরটা যেন ভেঙ্গে পড়ল। জীবনে কোনদিন সে মার খায়নি। সবাই তাকে ভালবেসে এসেছে, তাই ভাগ্যের বিড়ম্বনায় এই প্রথম আঘাত তাকে অত্যন্ত পীড়া দিলে। চোখের কোণে জল দেখা দিল। কিন্তু নীরবে সে সহ্য করে গেল সেটা। আঁচিলওয়ালা আবার রূঢ় কণ্ঠে বলল, এখনও ভেবে ছাখ, আমাদের কথা মেনে চলবি কি না। নইলে এই চাবুকের আঘাতে গায়ের চামড়া টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলব।

একটা রুদ্ধ আক্রোশে সে যেন হাঁফাচ্ছিল। নিশীথ দেখতে পেলে, এই হীন লোকটার ভদ্রতার খোলস খুলে তার হিংস্র প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। নিশীথের মনে হলো এই রকম হিংস্র প্রকৃতির বিকাশ সে দেখতে পেয়েছে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন হিংস্র জন্তুর মুখে, তাদের ক্রোধের উন্মাদনার সময়। পার্থক্য শুধু দেহ ভেদে। আঁচিলওয়ালার দাঁতগুলো শ্বাপদ জন্তুর দাঁতের মত চিক্ চিক্ করে উঠল। নিশীথ নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে সেই হিংস্র মুখমণ্ডলের ছবি দেখতে লাগল। কী ভীষণ সে মুখ!

কঠোর কণ্ঠে আঁচিলওয়ালা জিজ্ঞেস করলে, কি ভাবছিস্?
—দেখছিস্ কি অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে?

নিশীথ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলে, ভাবছি যদি একবার ছাড়া পেতুম, তবে তোমার আঁচিল আর দাঁতগুলো তুলে ফেলতে পারতুম। যাদুঘরে পাঠাবার মত জিনিষ ওগুলো।

নিশীথের কথা শুনে আঁচিলওয়ালা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে সে মোটেই ভয় পায়নি দেখে সে ক্ষিপ্ত হয়ে নির্ম্মমভাবে চাবুক চালাতে লাগল। নিশীথ দাঁতে দাঁত চেপে সে আঘাত সহ্য করে যেতে লাগল। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তার রক্তের ধারা বয়ে যেতে লাগলো। সমস্ত স্নায়ু তার অবশ হয়ে আসতে লাগল। একটা আর্ত্তনাদ করে সে বসে পড়ল।

প্রহরী দুটো আবার তাকে অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে টেনে তুলতে যাচ্ছিল, এমনি সময় দেখা গেল গুহামুখে সর্দ্দার দাঁড়িয়ে। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে সে, কি হচ্ছে ওখানে?

মন্ত্রের মত কাজ করলে সে সুর। সকলে সম্ভ্রমে দূরে সরে রইল। নিশীথ সভয়ে দেখল, কাঠ বিড়ালীর মত সর্দ্দার মই বেয়ে নেমে আসছে। পরণে তার তেমনি সাহেবী-পোষাক, আর মুখে রবারের মুখোস। গুহার মধ্যে টর্চ্চের আলোয় সে মুখটা ভীষণতর দেখা গেল। নিশীথ চোখ বুজে ফেলল।

এবার আর তার রক্ষা নেই। সম্ভবতঃ আজই একটা শেষ ব্যবস্থা তার হয়ে যাবে। সর্দ্দারের অনুচরের যে পরিচয় পেল, তাতে সর্দ্দারের হুকুম যে কি হবে, তা সে অনায়াসে অনুভব করল। সর্দ্দারের সম্যক পরিচয় সে কালই পেয়ে এসেছে। নির্ম্মমতার চূড়ান্ত প্রতিমূর্ত্তি সে, কাজেই ভাল ব্যবহারের প্রত্যাশা তার কাছে দুরাশা মাত্র। নিশীথের মন আরও কঠোর হয়ে উঠল। অত্যাচারের মাত্রা যখন সুরু হয়েছে তখন সে কখনও নতি স্বীকার করবে না।

সর্দ্দার এসে সবার মাঝে দাঁড়াল। নিশীথ আশ্চর্য্য হয়ে দেখল, সবাই তার ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। সকলের এই ভাবান্তর দেখে সে হতবাক্ হয়ে রইল।

সর্দ্দার আঁচিলওয়ালার আপাদমস্তক দেখতে লাগল। আঁচিলওয়ালা সে দৃষ্টির প্রকোপে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সর্দ্দার দৃঢ় কণ্ঠে বলল, তোমায় এসব করতে কে বলল? কেন এসব করা হল?

আঁচিলওয়ালা কাঁপতে কাঁপতে সর্দ্দারের পায়ে পড়ল, আমায় ক্ষমা করুন। সর্দ্দারের ইঙ্গিতে প্রহরী দুটো তাকে টেনে তুললে, কর্কশকণ্ঠে সর্দ্দার আবার বললে, আমার কথার উত্তর দাও?

সে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলে, সর্দ্দারের অবমাননা সহ্য করতে না পেরে এ ব্যবস্থা করেছি।

সর্দ্দার ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল, সর্দ্দারের অবমাননা করতে পারে, এ দুনিয়ায় এমন কেউ এখনও জন্মায় নি। আমাকে না জানিয়ে বিচারের ভার তোমরা নিলে কোন্ সাহসে? আচ্ছা—

সর্দ্দার গম্ভীরভাবে গুহার মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। নিশীথ এই সুযোগে সাহস করে বললে, আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দলবল নিয়ে এসে এমন ভাবে অত্যাচার করার কারণ কি জানতে পারি আমি?

সর্দ্দার সে কথার কোন জবাব দিল না। ইঙ্গিত পেয়ে প্রহরী দুটো তার বাঁধন খুলে দিল। নিশীথ তার রক্তাক্তদেহ-

খানা তার সামনে টেনে নিয়ে বললে, এই ছ্যাখো তোমার অনুচরেরা আমার কি অবস্থা করেছে। বিশেষ করে ঐ আঁচিল-ওয়ালা কুকুরটা। কাল থেকে এরা আমায় কিছুই খেতে দেয়নি। আজ দিয়েছে পচা রুটির দুটো টুকরো—

নিশীথ রুটি দুটো কুড়িয়ে এনে সর্দ্দারের সামনে ধরে বলল, চেয়ে ছ্যাখো কি খেতে দিয়েছে আমায়। কুকুরেও ছোঁবে না এগুলো। জানিনে এসব তোমার হুকুমে হয়েছে কি না। এমনিভাবে জঘন্য অত্যাচার করার বদলে তুমি একেবারে মেরে ফেলার হুকুম দাও। তারপরে তোমাদের ঐ কাঁচের পাত্রে পুরে রেখো আমার মাথা ;—যেমন করে রেখেছ কতকগুলো সাজিয়ে। তারপরে পরীক্ষা করে দেখো, ঐ মাথাগুলো দিয়ে তোমার জাল নোট ছাপানো চলে কি না।

সর্দ্দার পরুষ কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল, থাম। আমি কি করব সে সম্বন্ধে তোমায় উপদেশ দিতে হবে না। প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করতেও আমি কোনদিন কুণ্ঠিত হইনে, এ তুমি কালই দেখেছ। তোমার বাচালতা আমার দুচক্ষের বিষ।

নিশীথ উগ্রকণ্ঠে বলল, কী ক্ষতি করেছি আমি তোমাদের! আমায় অযথা টেনে এনে এই অত্যাচার সুরু করেছ কেন? তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইনি এই অপরাধেই কি আমার এই শাস্তির ব্যবস্থা? চমৎকার বিচার বুদ্ধি তোমাদের!

সকলে মনে মনে শিউরে উঠল, কিন্তু সর্দ্দারের কথার কোন

জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পায়চারী করে শেষে বলে উঠল, এদের শাস্তির ভার আমি তোমার উপরই ছেড়ে দিচ্ছি নিশীথ, তুমি ইচ্ছা করলে এদের যে কোন শাস্তি দিতে পারো, এমন কি প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত। তোমার হুকুম এখনই তামিল হবে। এতে আমার যথেষ্ট ক্ষতি হবে বটে, কিন্তু আমার হুকুম না নিয়ে কাজ করার ফল এদের পেতে হবে।

সর্দ্দার আবার পায়চারী সুরু করে দিল।

নিশীথের মন জিঘাংসায় ভরে গেল। এই আঁচিলওয়ালা লোকটা নির্ম্মমভাবে আঘাত করে তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। এখনও সে ক্ষত থেকে অনর্গল রক্তধারা বয়ে পড়ছে। অত্যন্ত ইতর ভাষায় গালাগালি করেছে সে। ঠাণ্ডাঘরে বিভীষিকার রূপ দেখিয়ে তাকে অজ্ঞান করে রেখে ছিল। সর্ব্বনাশের মূল সে। ফরমূলা চুরির ব্যাপার থেকে সব ব্যাপারই তার মনে এসে সমস্ত মনে একটা হিংস্রভাবের আভাস জাগিয়ে তুলল। প্রহরী দুটো নির্ম্মমভাবে তাকে টেনে তুলে অত্যাচারের সাহায্য করেছে। ঐখানে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বিরাট দেহী পুরুষ,—যে তাকে সম্মোহিত করে নিয়ে এসেছিল। সকলেই এখন তার কবলের মধ্যে। একটা হুকুম করলে সকলের মাথাই দেহচ্যুত হবে। এতগুলো লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়েছে সে। ব্যাপারটা যেন তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তার মনে হলো সর্দ্দার তার সঙ্গে চাতুরী

খেলছে। একটা অবিশ্বাসের হাসি হেসে নিশীথ বলে উঠল, সত্য বলছ সর্দ্দার ;—এই এতগুলো লোকের যে-কোন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি আমি!

দৃঢ়কণ্ঠে সর্দ্দার বললে, আমার কথার কোন নড়চড় হয় না।

নিশীথ অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলে,—যদি সবারই আমি প্রাণদণ্ড দেই!

সকলে একথা শুনে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ভয়ে কারও মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না। এমন কি ঐ বিরাট দেহী পুরুষটাও রুদ্ধ-বাক্ হয়ে রইল।

সর্দ্দার গম্ভীর কণ্ঠে বললে, তাহলে ঐ প্রাণদণ্ড প্রত্যেককেই নিতে হবে মাথা পেতে। আমার অবশ্য অনেক ক্ষতি হবে, কিন্তু উপায় নেই। তুমি শাস্তির ব্যবস্থা করো নিশীথ, আমার আর সময় নেই। আমায় এখনই বেরোতে হবে। আর তোমাকেও একথা জানিয়ে যাচ্ছি, এক মাসের মধ্যে তোমার কাজের ফলাফল জানতে চাই আমি। ঠিক এক মাস পরেই আমি ফিরবো। তোমার কাজে কোন ত্রুটী যেন না হয়। আমার হুকুমের নড়চড় হয় না, তার পরিচয় তুমি নিজেই এখন পাবে।

নিশীথ একটু হেসে বললে, তোমার কথা তো বুঝলুম সর্দ্দার, কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব হবে, ভেবেই ঠিক করতে পারছিনে আমি। এতগুলো সশস্ত্র লোকের প্রাণদণ্ড দিতে গেলে যে ফল

তার উল্টো হবে এটা তো যে-কোন শিশুও বুঝতে পারে। আমি একা এবং নিরস্ত্র।

সর্দ্দার হুকুম করল, যার যার কাছে, অস্ত্র রয়েছে নিশীথের কাছে দিয়ে দাও।

মুহূর্ত্তের মধ্যে হুকুম পালিত হল। এমন কি কাপড়ের নীচ থেকে লুক্কায়িত রিভলভারও বের করে দিলে তারা। নিশীথ অবাক্ হয়ে পরিত্যক্ত অস্ত্রগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

সর্দ্দার জানালো রিভলভারগুলোর প্রত্যেকটিতেই গুলি রয়েছে, ইচ্ছা করলে ওগুলোও ব্যবহার করতে পার। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। সর্দ্দার পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে ফেলল। তারপর নিশীথকে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়ানো দেখে বলে উঠল, নিজ হাতে শাস্তি দিতে তোমার মন উঠছে না দেখছি, আচ্ছা এর ব্যবস্থা করছি।

সর্দ্দার সঙ্কেত-ধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গে চারজন লোক সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো গুহার ভেতর। সর্দ্দার আদেশ করলে, তোমাদের অস্ত্র রেখে দাও ওখানে।

সকলে মন্ত্র-চালিতের মতে নিশীথের সামনে অস্ত্র রেখে দিল। সর্দ্দার তাদের জানাল, এদের শাস্তির ভার আমি ওর উপর ছেড়ে দিয়েছি। প্রাণদণ্ডও ইচ্ছা করলে দিতে পারে ও। হুকুমমত কাজ করো তোমরা। আমি চললুম। সকলে তটস্থ হয়ে নিশীথের হুকুমের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সর্দ্দার গুহামুখের পথে অগ্রসর হল। সহসা নিশীথ গুরুগম্ভীর ভাবে বলে উঠল, দাঁড়াও সর্দ্দার আমার কথা শুনে যেতে হবে তোমায়। সর্দ্দার নিশ্চলভাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। নিশীথ ততোধিক গম্ভীর হয়ে বললে, কুকুরকে আমি কামড় দিতে চাইনে, এদের ছেড়ে দাও তুমি।

সর্দ্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

সাত

সারা গায়ে একটা তীব্র ব্যথার প্রকোপ অনুভব করছিল নিশীথ। ডাক্তার এসে ঔষধ দিয়ে বাণ্ডেজ করে দিয়েছে তাকে, কিন্তু ব্যথা তাতে যেন বেড়েছে বলে নিশীথের মনে হতে লাগল। এই দুরুহ অঞ্চলে এদের অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই। ডাক্তারের মুখ চোখেও একটা কুটিল ভাব দেখে নিশীথ ভাবলে, এদের প্রত্যেকেই যেন দয়া মায়া লেশ হীন হিংস্রতার প্রতিচ্ছবি। সবাই যেন কলের মত সর্দ্দারের আদেশ মেনে চলেছে। কোন কিছুর ত্রুটী হলেই মৃত্যু তাদের অনিবার্য্য, এটা তারা ভালভাবেই জানে। অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের প্রচেষ্টায় এরা এমনি জঘন্যতম পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, যে-কোন হীনতম কাজ করতেও তারা বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হয় না।

এমন কি ঐ ডাক্তারকেও যদি জল্লাদের কাজ করতে দেওয়া হয়, হাসিমুখেই সে তা করবে। তার উপর এই যে ভাল ব্যবহার সুরু হয়েছে, এও যে সর্দ্দারের ইঙ্গিতে—তা বুঝতে নিশীথের দেরী হল না। একটুখানি বিপরীত অঙ্গুলি হেলনেই ঘটনার বিপর্য্যয় ঘটে যাবে।

সর্দ্দার যেন শুধু বিভীষিকা নয়, একটা বিস্ময়ের বস্তুও বটে। যতবার নিশীথ তাকে দেখেছে, সব সময়েই মুখোস-পরা অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়েছে। সর্দ্দার কি তার মুখাকৃতি নিশীথের কাছেই গোপন রাখে,—না এদের কেউ তার আসল মুখাবয়ব জানে না, এটা নিশীথ ভেবে ঠিক করতে পারলে না। সকলকে রহস্যে আবৃত রেখে এ অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্যই বা কি? এ দুর্গম গুহার কেল্লার সন্ধানই বা সে পেলে কি করে, আর কি ভাবে তারা চোরাই আফিমের কারবার চালায় এটা জানবার প্রবল আগ্রহ তার মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নানারকম চিন্তায় অন্যমনস্কতার সুযোগে তার যন্ত্রণাও যেন একটু কমে আসতে লাগল। অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙ্গে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলে তার সামনে বসে রয়েছে এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ব্যক্তি। সারা গায়ে তার কম্বল জড়ানো। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। চেহারা দেখলেই একটা আভিজাত্যের ছাপ ধরা পড়ে। নিশীথ তাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এই সুদূর জায়গায় কুখ্যাত

দলে এ ব্যক্তিটি কে? ইনিও কি নিশীথের মতই হৃত হয়ে এখানে এসেছেন। নিশীথ চেয়ে রইল তার দিকে।

ভদ্রলোক মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলে, ঘুম ভাঙ্গল তোমার?

নিশীথ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কে আপনি? আপনাকে আগে দেখেছি বলে তো মনে হয় না। ভদ্রলোক একটু হাসলেন। তারপর চশমাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, আমি এখন এদেরই দলের একজন হয়ে পড়েছি। সর্দ্দারের কাছে শুনে থাকবে তাদের দলের এক বৈজ্ঞানিকের কথা। আমিই সেই হতভাগ্য বৈজ্ঞানিক।

তাঁর স্বরে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠল। নিশীথ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে এলেন কি করে? আমার মত আপনাকেও কি অজ্ঞান করে টেনে নিয়ে এসেছে ওরা? স্বেচ্ছায় আপনি এসেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না?

ভদ্রলোকের মুখে চোখে একটা অস্বস্তিকর ভাব ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, অজ্ঞান করে আমাকে আনা হয়নি বটে, কিন্তু আসতে হয়েছে বাধ্য হয়ে, সম্পূর্ণ অনিচ্ছার সঙ্গে। যাক্ এসব আলোচনা করে আর লাভ কি? তুমি ভেবে কি ঠিক করলে?

নিশীথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, ভাববার আর কি আছে বলুন? বৈজ্ঞানিকের আদর্শচ্যুত হতে চাইনে আমি। এর জন্য

যা আমার ভাগ্যে থাকে তাই ঘটবে। আপনার মত আত্ম বিক্রয় করতে আমি চাইনে।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন। অত্যন্ত করুণ সে হাসি। সমস্ত মুখমণ্ডল যেন একটা ম্লান ছায়ায় ভরে গেল। তারপর মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, বৈজ্ঞানিকের মতই তুমি কথা বলেছ নিশীথ। আমারও আদর্শ তাই ছিল। কিন্তু তুমি জান না, প্রয়োজনের খাতিরে এরা কত নিষ্ঠুর! ঐ কাঁচের জারে যাদের মাথা রাখা হয়েছে, কত নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই না তাদের প্রাণ হরণ করা হয়েছে! একজনের ইতিহাস আমি জানি। সে ঘটনার কথা বলে আমি তোমার মন ভারাক্রান্ত করতে চাইনে।

নিশীথ বিরক্তি প্রকাশ করে বললে, আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন। ভদ্রলোক দৃঢ়স্বরে বললেন, না, বরঞ্চ প্রকৃত ঘটনা তোমার জানা আবশ্যক বলেই বলছি। তুমি এদের প্রকৃতির সামান্য পরিচয় মাত্র পেয়েছ। সর্দ্দারের কাছে একটু ভাল ব্যবহার পেয়েছ বলে মনে করছ বিপদের মাত্রা তোমার কেটে যাবে। কিন্তু সর্দ্দারের নিষ্ঠুরতার সামান্যতম আভাসও তুমি জান না, ঐ হিংস্রলোকটা নিজের স্বার্থের জন্য এমন কাজ নেই, যা করতে দ্বিধা বোধ করে। আর ভয়ের কথা বলছ, আমি বহুদিন যুদ্ধে ছিলুম। যুদ্ধের বহু ভয়াবহ চিত্র আমার চোখের সামনে এখনও ভাসছে, কিন্তু এ নিষ্ঠুরতা তার কাছে ম্লান হয়ে পড়ে।

নিশীথ জিজ্ঞেস করলে, আপনি আমায় কি করতে বলেন? এদের দলে যোগ দিতে হবে এই তো? ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, না, আমি তা বলিনে, তুমি কি করবে সেটা তুমিই ঠিক করবে। নিজে আদর্শচ্যুত হয়েছি বলে তোমাকেও অধঃপাতের পথে টেনে আনব, এমন প্রবৃত্তি আমার নেই। আর এ পথে এসে নেমে পড়লেই যে নিষ্কৃতি পাবে তারও কোন স্থিরতা নেই। এদের দলে এসে কেউ নিষ্কৃতি পেয়েছে বলে জানিনে। আজ প্রায় ছ'মাস হল আমাকে এখানে আনা হয়েছে। আজ থেকে ঠিক একমাস পরেই আমি মুক্তি পাব। কিন্তু সে যে চরম মুক্তি তা আমি জানি। আর এই হবে আমার হীনতার পুরস্কার!

নিশীথ বিস্ময় প্রকাশ করতে তিনি বললেন, এরা শাঁখের করাত নিশীথ। দুইদিকেই কাটে। রক্ষা পাবার কোনই উপায় নেই আমাদের। সর্দ্দার আদেশ দিয়ে গিয়েছে তোমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তোমার উপর সমস্ত কার্য্যভার দেবার জন্য। অবশ্য তুমি যদি অসম্মত হও তাহলে দুজনেরই ঐ মাসান্তের দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে হ'বে। অবশ্য এভাবে থাকতে পারবো না আমরা। সেজন্য আমাদের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা আছে। কয়েক রাত তো কাটিয়ে এসেছ তুমি সেখানে।

নিশীথ শিউরে উঠল সে কথায়। আগ্রহের সঙ্গে সে জিজ্ঞেস করলে আপনার কথায় মনে হয় আপনি এদের উপর

সন্তুষ্ট নন। শুধু পাকেচক্রে আমার মত এসে পড়েছেন এখানে। কি করলে ভাল হয় আপনিই একটা উপদেশ দিন।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ভেবে চিন্তে বললেন, কি জান নিশীথ, তোমার উপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে আমার। তোমার ঐ প্রতিভাব্যঞ্জক মুখ আর গবেষণার অন্তর্দৃষ্টি দেখে স্বভাবতঃই একটা মায়া এসে পড়ে। এমনি একটা ঘৃণ্য সংস্পর্শে এসে পড়েছি আমরা যে, এদের বাঁধন কাটিয়ে যাওয়া অত্যন্ত মুস্কিল। তুমি এখানে আসবার পথ জান না, কিন্তু আমি সেটা চিনি। পথপ্রদর্শক না থাকলে এই তুষার-ভূমি পার হয়ে পথ বেয়ে চলা সম্ভবপর নয়। এমনি বিপজ্জনক সে পথ যে, কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

নিশীথ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, আপনি কি পলায়নের কথা চিন্তা করছেন। ভদ্রলোক ঠোঁটে হাত দিয়ে বললেন, চুপ, দেওয়ালেরও কান আছে এখানে। সর্দ্দার আজ চলে গেছে। সাময়িক মুক্তি পেয়ে সবাই আনন্দে মত্ত হয়ে রয়েছে। কাজেই সুযোগ পেয়ে চলে এসেছি তোমার কাছে। আর তাছাড়া ওরা জানে সর্দ্দার আমাকে তোমায় কাজে লাগানোর জন্য বোঝাতে বলে গিয়েছে, কাজেই এখন আর আমাকে বিরক্ত করবে না। নইলে তোমার সঙ্গে দেখা করাও নিষেধ ছিল আমার। এদের দলে কাজ করলেও এরা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে।

নিশীথ বলে উঠল, আশ্চর্য তো!

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, আশ্চর্য্যই বটে! কি জানি আজ মনে হলো, তোমাকে আজ সব কথা খুলে বলব। জীবনের মেয়াদ আর একমাস, হয়ত খুলে বলার আর সময়ই হবে না। আমার সব কথা শুনে হয়ত কোন কর্ম্মপন্থা খুঁজে বের করতে পারবে তুমি। আমি পাইনি। তাই ব্যাকুল হয়ে শেষ দিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি।

নিশীথ দুঃখ প্রকাশ করে বললে, আপনাকে কি এরা মেরে ফেলবে ঠিক করে ফেলেছে।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, সর্দ্দারের কথা নড়চড় হয় না নিশীথ। অন্ততঃ এই ছয় মাস আমি তাই দেখে আসছি।

নিশীথ হেসে বললে, সেটার পরিচয় তো আজই পেলুম।

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, একটা দুঃখ রয়ে গেল নিশীথ, নিজের আদর্শ বলি দিয়ে শুধু নিজের প্রাণই হারাতে বসেছি, কিন্তু দুষ্কৃত দলের কোন ব্যবস্থা করতে পারলুম না?

নিশীথ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি করতে চান আপনি?

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিশীথের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কাছে বলা চলবে সেটা, তোমার কাছ থেকে প্রকাশ হ'বার ভয় নেই, এ আমি বুঝতে পেরেছি। মানুষ চিনি আমি। তাছাড়া প্রকাশ হলেই বা ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে?

মৃত্যুর দুয়ারে অতিথি আমি, সব ভয়েরই বাইরে চলে গিয়েছি এখন।

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, আমি বলি কি নিশীথ এদের কাজে তুমি সম্মত হও। সর্দ্দারের সুনজর এখনও তোমার উপর আছে। আর তাছাড়া তুমি নিজে শত আঘাত পেয়েও এদের দলের অনেককে প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি দিয়েছ। কাজটা তোমার ভাল হয়েছে কি না সে নিয়ে আমি সমালোচনা করতে চাইনে এখন, কিন্তু এখন তোমার কথা সবাই মেনে চলবে, বিনা প্রতিবাদে—অন্ততঃ একমাস পর্য্যন্ত। অবশ্য তুমি যদি এদের কাজে যোগ দাও। নইলে কি হ'বে সে আগেই তোমায় জানিয়েছি। সুতরাং তোমার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। তুমি রাজী হলে ভবিষ্যতের প্লান আমি তোমাকে জানিয়ে দেবো।

নিশীথ অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবল। তার মন নানা সংশয়ে ভরে গেল। এই বৈজ্ঞানিক আঁচিলওয়ালার মত ভদ্রতার খোলস নিয়ে তাকে প্রতারিত করবার প্রচেষ্টা করছে কিনা তারই বা ঠিক কি? এদের দলে যখন এই বৈজ্ঞানিক কাজ করছে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান নিশ্চয়ই লোপ পেয়েছে। হয়ত সর্দ্দারের আদেশমত তার মনের কথা জেনে নেবার প্রচেষ্টা চল্‌ছে এই বৈজ্ঞানিকের সহায়তায়। প্রলোভনের নানা রকম গণ্ডীর ভিতর টেনে নিয়ে তাকে এই হীনতম কাজে লিপ্ত

করার অভিপ্রায় তার সামনে যেন ফুটে উঠল। সহসা এই ফাঁদে পা দিতে তার মন চাইছিল না। এই বৈজ্ঞানিকের হঠাৎ এই অন্তরঙ্গতাও যেন একটু বিসদৃশ ভাব জাগিয়ে তুলছিল তার মনে।

ভদ্রলোক যেন তা বুঝতে পেরে বললেন, আমার কথায় তোমার একটু সন্দেহের ভাব দেখা গিয়েছে নিশীথ। এটা স্বাভাবিক। অন্য সুযোগ হয়ত পাব না তাই তোমার কাছে এখনই সব প্রকাশ করে বলেছি। যাক এখন কিছু উত্তর দেবার আবশ্যক নেই। বিশেষতঃ তুমি এখন অসুস্থ। বেশ করে ভেবে দেখো কথাগুলো, তারপর সেরে উঠে উত্তর দিয়ো।

নিশীথ ম্লান হাসি হেসে বললে, আর সেরে উঠব আমি! যা ব্যথা হয়েছে, সমস্ত শরীরটাই হয়ত পেকে উঠবে।

ভদ্রলোক হেসে উত্তর দিলেন, না, তা হবে না। যে ঔষধ দেওয়া হয়েছে তোমাকে, তার একটা বিশিষ্ট গুণ আছে। দুই এক দিনের মধ্যেই তোমার ঘা সব সেরে যাবে। ঔষধের ফলাফল আমি নিজে দেখেছি।

আঁচিলওয়ালা লোকটা এসে হঠাৎ ঢুকে পড়ল গুহার মধ্যে। তাকে দেখে নিশীথের মন বিরক্তিতে ভরে গেল। বৈজ্ঞানিকের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। বৈজ্ঞানিক সেই চিঠি পড়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল। তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে নিশীথ আঁচিলওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলে, কিসের চিঠি। আঁচিলওয়ালা সসম্ভ্রমে উত্তর দিলে, সর্দ্দার দিয়ে গেছেন যাবার সময়।

নিশীথ বিরক্তিভরে বললে, কি লেখা আছে ওতে ?

আঁচিলওয়ালা সসম্ভ্রমে আবার জানালো, ওঁর উপর একটা কাজের ভার দেওয়া আছে। সেটায় সফলকাম না হতে পারলে ওঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া রয়েছে।

শিউরে উঠল নিশীথ। রুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, দেখি চিঠিখানা। আঁচিলওয়ালা একবার ইতঃস্ততের ভাব দেখিয়ে চিঠিখানা নিশীথের হাতে তুলে দিল। নিশীথের মুখ যেন কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। তাহলে ভদ্রলোকে যা এতক্ষণ ধরে বললেন, সব সত্য। সর্দ্দারের হুকুম নড়চড় হয় না !

চিঠিখানা হাতের মুঠোয় করে রাখল নিশীথ। সামনে রয়েছে—বিনা অপরাধে সদ্য মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত প্রৌঢ় বৈজ্ঞানিক। আর সে দণ্ড দিয়েছে এক জঘন্য চোরের সর্দ্দার। হয়ত একদিন তার উপরও এই রকম দণ্ডের আদেশ হবে। নিশীথের মনে হল সমস্ত দলটাকে যদি সে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতো !

চিঠিখানা আঁচিলওয়ালার কাছে ফেলে দিয়ে সে বলল, এমনি করেই তোমরা পরিশ্রমের পুরস্কার দাও বুঝি ?

আঁচিলওয়ালা মাথা নত করে বললে, আমি আজ্ঞাবহ দাস মাত্র।

নিশীথ ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, সমস্ত হীনতার মূলে আছ তুমি। অনর্থক আমাকে টেনে এনেছ এই নরক কুণ্ডে। একটা বৈজ্ঞানিকের জীবনের দাম তোমরা কি করে বুঝবে ? তোমার

মুখ দেখলেও পাপ হয়। অলক্ষুণে আঁচিল নিয়ে তুমি আমার সামনে আর এসো না। পার তো ওটা কেটে ফেলে দিয়ো। হিংস্র শ্বাপদ কোথাকার।

আঁচিলওয়ালা ধীর পদে সেখান থেকে চলে গেল।

বৈজ্ঞানিক নিশ্চল অবস্থায় বসেছিলেন এতক্ষণ। এতদিনের অনুমান আজ প্রত্যক্ষরূপে দেখা দিয়েছে তার কাছে। তিনি জানেন এ হুকুমের আর নড়চড় হবে না। পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেই হবে। মাত্র একমাস সময় আছে তার। এ একমাসের মধ্যে সর্দ্দারের অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় নেই। তবুও যদি নিশীথ তাকে সাহায্য করতো, হয়ত তিনি সফলকাম হতেন তাতে। কিন্তু না নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিশীথকে তিনি আর জড়াতে চান না। তার মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত সরে গেছে। কঠিন একটা পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াবার জন্য তিনি যেন শক্তি সঞ্চয়ে লেগে গেলেন। একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেকক্ষণ কেটে গেল। অবশেষে তিনি বললেন, আমার সময় হয়ে এসেছে নিশীথ। একটা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হয়ত আমাকে বন্দী অবস্থায় থাকতে হবে এ মাসটা; অন্ততঃ সর্দ্দারের যে তাই ইচ্ছা তারই আভাস আমি কাল পেয়েছি। সুতরাং তোমার সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবার সুযোগও হবে না। তাই যাবার আগে তোমায় একটা কথা বলে রাখছি, আশাকরি আমার এ অনুরোধটা রাখবে। যদি কোনদিন এদের হাত থেকে

রক্ষা পাও, তবে আমার একটা উপকার করবে তুমি। কলকাতায় আমার বাসার ঠিকানা দেবো তোমায়। সেখানে আমার ভাইপো থাকে। তোমাদের মতই বয়স তার, আর তোমার মতই বিজ্ঞান-শাখার ছাত্র সে। তাকে বলবে আমার কথা। তাকে বলো, কি ভাবে আমায় এখানে প্রাণ দিতে হয়েছে। সে যেন এর প্রতিশোধ নিতে ভুলে না। আমার উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে তার। হয়ত এর ব্যবস্থা সে করবে।

নিশীথ ম্লান হাসি হেসে বললে, হয়ত আমাকেও যেতে হবে আপনার পথে। তবু বলুন আপনি, আমার দ্বারা চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে এনে এখনই দিয়ে যাই। যতীশ তোমারই মতো দৃঢ়চেতা—

নিশীথ এতক্ষণ শুয়েই ছিল। হঠাৎ সে উঠে বসে বলে উঠল, কি নাম বললেন,—যতীশ ?

ভদ্রলোক একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, হাঁ, তুমি তাকে চেনো নাকি !

নিশীথ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, এক যতীশকে আমি চিনি, সে আমার পার্টনার ছিল কলেজের ল্যাবরেটারীর। তার কাকা বিলেত-ফেরৎ, মস্ত বৈজ্ঞানিক। এই দার্জ্জিলিংএ এসেই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন মাস ছয়েক আগে।

ভদ্রলোক সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলে, যতীশের সে সন্ন্যাসী কাকার নাম জানো ?

নিশীথ তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, সীতেশ বাবু। মস্তবড় বৈজ্ঞানিক, হঠাৎ বিজ্ঞানের উপর ভক্তি হারিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যান, তাঁর সম্বন্ধে কতকথা শুনেছি যতীশের কাছে।

ভদ্রলোক নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন। এত দুঃখের মধ্যেও তাঁকে হাসতে দেখে নিশীথ অবাক্ হলো, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললে, এবার চিনতে পেরেছি আপনাকে। এতবড় বৈজ্ঞানিক হয়েও আপনার এই অবস্থা হয়েছে। সন্নাসী হওয়ার ভুল সংবাদ শুনেছে যতীশ তা হলে ?

সীতেশবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, কে রটিয়েছে আমার সন্ন্যাসী হবার সংবাদ তা আমি জানিনে। তবে অতর্কিতভাবে এদের হাতে পড়ে আমায় এখানে আসতে হয়েছে। অবশ্য জ্যোতিষ বিদ্যা কিছু চর্চ্চা করছিলাম এর আগে, তাই থেকেই এটার উৎপত্তি হবে বোধহয়। যা হোক যতীশকে যখন চেনো, তখন আমার কথা তাকে অবশ্যই জানিয়ো। উঠি এখন, অনেক কাজ আছে আমার। আবার হয়ত আজ রাতেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে আমায়।

নিশীথ বলে উঠল, আমি এদের দলে যোগ দিলে আপনার মুক্তির কোন সম্ভাবনা আছে কি সীতেশবাবু ? তাহলে আমার অবশ্য আপত্তি নেই।

সীতেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না তা নেই। এদের দলে যোগ দাও আর না দাও, মুক্তি পাবার কোনই পথ নেই আমাদের। মুক্তি পাবার পথ আমাদের নিজেরই রচনা করে নিতে হবে। অত্যন্ত কঠিন সে পথ। একটু অসতর্ক হলেই সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে। আর তাতে সফল হলে আমরা যে রক্ষা পাবো তারও স্থিরতা নেই। তবে এ পথে অগ্রসর হতে হলে তোমার সাহায্য ছাড়া এগোবার কোনই উপায় নেই। আজ সারাদিন ধরে এই চিন্তা করেই আসছি।

নিশীথ ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে কি সে উপায়?

আট

ল্যাবরেটারীতে তখনও প্রবীন দুই বৈজ্ঞানিক নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলছিল। আজ ক'দিন ধরেই কাগজের উপর বিভিন্ন রং‌এর প্রক্রিয়া চল্‌ছে। নানারকম ছাঁচ রয়েছে সেখানে। নোট জাল করার সব সাজ-সরঞ্জামই তাদের তৈরী। নোটের যত কাগজের বাণ্ডিল সারি সারি সাজানো রয়েছে ল্যাবরেটারীর এক পাশে। তারই এক বাণ্ডিল নিয়ে এই দুই বৈজ্ঞানিকের গবেষণা চলছিল—কি করে নোটটাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলা যায়। টেষ্ট-টিউবে নানারকম রং সাজানো রয়েছে। ছাপানো

নোট তীব্র ইলেকট্রিকের আলোয় ধরে আতশী কাঁচে পরীক্ষা চলছে কোনও সামান্যতম খুঁত আছে কি না নোটের ভেতর। সাফল্য তারা অর্জ্জন করেছে বটে, কিন্তু এই সাফল্য তাঁদের মনকে পীড়া দিতে লাগল—দেশের ক্ষতিকর কাজে তাঁদের এই প্রতিভার অপচয় করা হবে ভেবে। নিশীথের মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, এই ল্যাবরেটারী ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে সে যেন মুক্ত হওয়ায় ফিরে যায় আবার। যেখানে হিংস্র কুটিলতা নেই, আছে শুধু আবিষ্কারের অনাবিল আনন্দ। কিন্তু এখন তো তা হবার জো নেই। সুযোগের প্রতীক্ষা তাদের করতেই হবে।

জালনোট একখানা হাতে ক'রে নিশীথ বললে, এ আমরা কোন্ পথে চলেছি সীতেশবাবু। শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয়ের অবস্থা হয়েছে আমাদের।

সীতেশবাবু তার কোন উত্তর না দিয়ে আতশী কাঁচটা হাতে নিয়ে বললেন, তুমি কখনো যুদ্ধ দেখেছো নিশীথ?

নিশীথ উত্তর দিলে, না।

সীতেশবাবু নোটখানা তার হাত থেকে নিয়ে কাঁচের সামনে ধরে পরীক্ষা করতে করতে বললেন, যুদ্ধের কথা পড়েছ নিশ্চয়, সৈন্যরা কেমন করে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যায় জানতো? নিজেদের তারা ঢেকে নেয় গাছপালা দিয়ে, যাতে করে এরোপ্লেনের বোমা তাদের উপর এসে না পড়ে। ইংরাজীতে তাকে বলা হয় ক্যামোফ্লেজ। আমাদের এই আবিষ্কার করবে

ক্যামোফ্লেজের কাজ। ভালকথা, যে সমস্ত জিনিষ তোমায় সংগ্রহ করতে বলেছিলুম সেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে তো। নিশীথ হেসে বললে, আজই সে-সব এসে পৌঁছেছে। প্যাকেট খুলে দেখেছি সব ঠিক আছে।

সীতেশবাবু নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরা কিছু সন্দেহ করে নি তো। নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, বোধ হয় না। করলে হয় তো এনে দিত না।

সীতেশবাবু একটু থেমে বললেন, এইবার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের এগোতে হবে। তারপর একটু হেসে বললেন, যুদ্ধক্ষেত্রের বিদ্যা কাজে লেগে যাবে এখন।

নিশীথ একটু হেসে বললে, এ একটা বিরাট ধ্বংসের ব্যবস্থা হচ্ছে সীতেশবাবু। ভাবছি এর ধাক্কা আমরা কুলিয়ে উঠতে পারলে হয়।

সীতেশবাবু মৃদু হেসে বললেন, বিপদে যখন পা দিয়েছ একবার, তখন বিপদ অবলম্বন করেই রক্ষা পেতে হবে তোমায়। হয়ত এতে আমরাও নিশ্চিহ্ন হতে পারি, কিন্তু তবু দেশের একটা বড় কাজ করে যাব।—নয় কি?

নিশীথ বললে, ল্যাবরেটারীটা দেখে কেমন যেন একটা মায়া হয় সীতেশবাবু। এটাকে নষ্ট করতে মন যেন চায় না। ছোটখাট হলেও এই দুর্গম স্থানে এই ল্যাবরেটারী কি করে যে সম্ভবপর হলো তাই ভেবে ঠিক করতে পারিনে।

সীতেশবাবু উত্তর দিলেন, এই ল্যাবরেটারী যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ তিনি কোথায় জান নিশীথ ?

নিশীথ বললে, কি করে জানব বলুন ?

সীতেশবাবু বলে চললেন, তিনি এ দলের একজন প্রবীন পাণ্ডা ছিলেন। অগাধ ছিল তার জ্ঞান। কিন্তু সে জ্ঞান অকল্যাণের পথেই নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। ফলে পরিণাম তার ভাল ভাবেই হল। একটা দলে দুজন কর্ত্তা থাকতে পারে না তো, তাই তাকে বিদায় নিতে হলো।

নিশীথ জিজ্ঞেস করলে, তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিলে বুঝি।

সীতেশবাবু একটু হাসলেন। আতশী কাঁচটা নাড়াচাড়া করে বললেন, না তাড়িয়ে দেওয়া বোধ হয় এদের কোষ্ঠিতে লেখে না। এরা চিরকালের জন্য বিদায় দিতেই অভ্যস্ত। অবশ্য তার চিহ্ন একটা রেখে থাকে। সেদিন যে কাঁচের পাত্রগুলো দেখেছিলে, তারই তিন নম্বরে এর পরিচয় মিলবে। অবশ্য এ ঘটনা ঘটেছিল আমার এখানে আসার মাস দুই আগে। এখানে এসে সর্দ্দারের মুখে শুনেছি সব ব্যাপারটা। বোধ হয় আমাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দেওয়ারই উদ্দেশ্য ছিল তার। নইলে সর্দ্দার খুব কম কথা বলে, আর যেটুকু বলে সেটুকু যেন বিষের টুক্‌রো।

নিশীথ ঘৃণার সঙ্গে বললে, অথচ এদেরই কাজে সাহায্য

করে চলেছি আমরা। সীতেশবাবু বললেন, এর চেয়ে বরঞ্চ বলো, আত্ম রক্ষার একটা পথ পরিষ্কার করে চলেছি আমরা। আর তাছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য সফল হলে দেশেরও একটা মস্ত উপকার করা হবে। নিশীথ! দেখছি তুমি কিছুতেই মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে উঠতে পারছ না। মনটাকে শক্ত করে ফেল নিশীথ, নইলে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে আমাদের।

নিশীথ একটু ভেবে বললে, সে আমি বুঝি, কিন্তু তবু কেমন যেন একটা খটকা থেকে যায়। আচ্ছা সীতেশবাবু, শেষ কালে যদি ব্যাটারী কাজ না করে!

সীতেশবাবু র্ভৎসনা করে বললেন, নিজে বৈজ্ঞানিক হয়ে তুমি এ কি করে বললে ভেবে আমি অবাক্ হয়ে যাই। সমস্ত জিনিষ ঠিক থাকলে বিজ্ঞান কখনো বঞ্চনা করে না। জল ফুটলে বাষ্পই হয়, বরফ হয় না, এও কি তোমাকে বোঝাতে হবে। এ বিষয় আমার উপর নির্ভর করতে শেখো নিশীথ, আমার অভিজ্ঞতা খুব কম নয় এ বিষয়ে। শুধু এ দেশী ডিগ্রী নিয়েই আমি ক্ষান্ত হয় নি, বিদেশের দু'চারটে ডিগ্রীও আমার আছে। আর ডিগ্রীর কথা ছেড়ে দিলেও যুদ্ধক্ষেত্রে হাতে-কলমে যে কাজ শিখে এলুম সেটাকেও কি তুমি স্বীকার করতে চাও না।

নিশীথ লজ্জিত হয়ে বললে, না আমি তা বলছিনে। তবে কেমন যেন ভয় হয় মাঝে মাঝে।

সীতেশবাবু বলে চললেন, সেটা স্বাভাবিক কেননা তুমি

কোনদিন এ রকম ঘটনার সম্মুখীন হওনি। এই দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে কি যে মনস্তাপে আছি নিশীথ তা আর কি বলবো। অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে আমায় এদের হাতে। সে কথা বিশদভাবে শুনে তোমার কোন লাভ নেই। তবে প্রতিশোধের বীজ যখন উপ্ত হয়েছে, তখন সহজে ছাড়ছিনে এ কথাও ঠিক। শুভক্ষণে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলতে হবে, তাই এই সুযোগ মিলে গেল।

নিশীথ একটু ভেবে বললে, এতগুলো লোকের চোখে ধূলি দিয়ে এগোনো খুব কঠিন কাজ হবে, নয় সীতেশবাবু ?

সীতেশবাবু সায় দিয়ে বললেন, সে তো নিশ্চয়। সেই জন্যই আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হ'বে। সমস্ত জিনিষ আমি পরীক্ষা করে তবে তৈরী করেছি। সব এখন ঠিক মত ব্যবস্থা করলেই হ'বে। আজ রাতেই সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে। আবহাওয়া যেরূপ দেখছি কালই হয়ত আবার তুষার ঝড় সুরু হ'বে আজ রাতেও হতে পা'রে। তবু তার মধ্যেই কাজ সারতে হ'বে আমাদের। আজকের রাত্রি কিছুতেই নষ্ট করা যেতে পারে না। সময় আমাদের খুব কম। আমার সবকথা তোমার মনে আছে তো ?

নিশীথ বলে উঠল, হাঁ।

সীতেশবাবু বলে উঠলেন, খুব সাবধানে কাজ করবে। মিলগুলো যেন সব ঠিক থাকে। ঔষধের গুড়োগুলো একটু

বেশী মাত্রাতেই মদের সঙ্গে মিশিয়ে দিও। ওঠবার শক্তি যেন না থাকে ওদের কারো, একথা যেন মনে থাকে। নইলে গুহা-পথে যাবার শব্দেই সব জেগে যাবে। অত্যন্ত সতর্ক এদের দৃষ্টি, সব সময়ই প্রায় সজাগ থাকে এরা।

নিশীথ হেসে উত্তর দিল, সে সমস্ত ব্যবস্থা আমি আপনার বলার সঙ্গে সঙ্গেই করে রেখেছি সীতেশবাবু।

সীতেশবাবু পিঠ চাপড়ে উত্তর দিলেন, এই তো বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছ। এরা ঘুমিয়ে পড়লেই তুমি এসে আমার গুহাটার মুখ খুলে দেবে। আমায় এরা অনেকটা বন্দীর মতই রেখেছে আজকাল; তাই বাইরে থেকেও গুহাটা বন্ধ করে দেয়। চাবিটা আঁচিলওয়ালার পকেটেই পাবে। তোমার উপর কখনও সন্দেহ জাগেনি। আর তাছাড়া পথটা তোমার চেনা নেই তাই তোমাকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়েছে।

নিশীথ হেসে বললে, একে আপনি স্বাধীনতা বলেন সীতেশবাবু?

হেসে উত্তর দিলেন সীতেশবাবু, কুয়োর ব্যাং, কুয়োর মধ্যে স্বাধীন ভাবে চলাফেরাকেই স্বাধীনতা বলে মনে করে বৈ কি?

নিশীথ বললে, আমাদের ল্যাবরেটারীর কাজ তো প্রায় সারা হয়ে গিয়েছে। এখন কি করা যায়?

সীতেশবাবু বললেন, এখন এই সব নিয়েই আবার নাড়াচাড়া করতে হবে। দেখাতে হবে আমার অনেক ব্যস্ত আছি এ

কাজে। আজকে ওদের ডেকে দেখিয়ে দাও কেমন নিখুঁত নোট তৈরী করেছ তুমি। এতে ওদের উল্লাসের বহর বাড়বে। হয়ত মদের মাত্রাও বেশী হবে ওদের। সেটা অবশ্য আমাদের পক্ষে ভালই হবে।

নিশীথ বলে উঠল, এ তো অভিনব প্রতারণা হবে।

সীতেশবাবু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, প্রতারণা কাকে বল তুমি। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—প্রতারকদের সঙ্গে প্রতারণা করাই সমীচীন।

নিশীথ আর কোন উত্তর দিলে না। সীতেশবাবু তাকে নির্ব্বাক দেখে বললেন, কথাগুলো সব তোমার মনে থাকবে তো?

নিশীথ শুধু মাথা নেড়ে জানালো। একটা টেষ্ট-টিউব হাতে তুলে সে একটু পরে বলে উঠল, সর্দ্দারের ফিরে আসার আর কয়দিন দেরী সীতেশবাবু?

দূরে একটা পদশব্দ শোনা যাচ্ছিল। সীতেশবাবু উৎকর্ণ হয়ে শুনে নিশীথকে ইঙ্গিতে সাবধান করে দিয়ে নোট একখানা আর আতশী কাঁচ তার হাতে গুঁজে দিলেন।

আঁচিলওয়ালা এসে গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল। তার কাটা ঘা এখন শুকিয়ে গিয়েছে। নিশীথ তার দিকে তাকিয়ে বিরক্তি ভরে বললে, তুমি আবার কেন জ্বালাতে এলে বল তো? তোমার মুখ দেখলেই আমার রাগ হয়। আঁচিলটা কেটে বুলডগের মত

চেহারা হয়েছে তোমার। ভাল কথা তোমার নামটি কি বলতো ? আঁচিলওয়ালা বলেতো ডাকা চলবে না এখন।

সে নত হয়ে উত্তর দিলে, এখানে নাম নিয়ে ডাকা নিষেধ। আমাকে ৩ নম্বর বলে ডাকবেন।

নিশীথ হেসে জবাব দিলে, জেলখানায় ঐ নম্বর দিয়েছে বুঝি! আমি ও নামে ডাকতে পারব না। আমি তোমার চিড়িয়াখানার নাম দিলুম বুলডগ।

রেগে লাল হয়ে উঠল সে। পরক্ষণেই নত হয়ে বললে, সর্দ্দার এই চিঠি পাঠিয়েছেন।

নিশীথ উৎসুক হয়ে বললে, আবার কোন মৃত্যুদণ্ড নাকি ? তোমার সর্দ্দার তো এ বিষয়ে ওস্তাদ জানি।

চিঠিটা খুলে সে পড়ল। তারপর তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, এ দেখছি তোমার নামে লেখা হয়েছে। সর্দ্দারকে জানিয়ে দিও তুমি, আমার কাজ আমি শেষ করে ফেলেছি। নমুনা স্বরূপ এই একটা নোট তার কাছে পাঠাতে পারো। আসল নোটের সঙ্গে কোন পার্থক্যই নেই এতে। আর জানিয়ে দিয়ো তাকে, সীতেশবাবুর সাহায্য না পেলে আমার এ বিষয়ে সফল হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

নোটখানা হাতে নিয়ে আলোর কাছে আতশী কাঁচ ধরে পরীক্ষা করে সে উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। নিশীথ অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে বললে, তোমার ঐ জানোয়ারী উল্লাস এখন

বন্ধ কর বুলডগ। যখন তখন এই ল্যাবরেটারীতে এসে ঢুকে পড়লে আমি সব কাজ বন্ধ করে দিয়ে তোমার সর্দ্দারকে জানাব সে কথা।

বুলডগের মতই মুখ ভার করে সে বললে, আর এ ঘরে আমি ঢুকবো না। সর্দ্দারের চিঠির জন্য ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়েছি। মদের বোতলগুলির প্রতি আঙ্গুল দেখিয়ে সে বললে, এগুলি কি নিয়ে যেতে পারি ?

নিশীথ তেমনি ভাবে বললে, সব গুলোই নিয়ে যাও তুমি। বারবার করে এসে বিরক্ত করবে, এ আমার সহ্য হবে না। আর মদ খেয়ে যে সারারাত তোমরা চীৎকার করবে এ যেন না হয়। রাত্রে আমার ভাল করে ঘুমানো দরকার।

লোকজন নিয়ে এসে মদের বোতলগুলো নিয়ে সে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরেই তাদের মাতলামির সুর ভেসে আসতে লাগল ল্যাবরেটারীর মধ্যে।

আধ ঘণ্টা পরেই সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এলো। একজন প্রহরী এসে দাঁড়ালো সীতেশবাবুর কাছে। তাকে এখন শুতে যেতে হবে। এই প্রহরীর উপরই ভার পড়েছে সীতেশবাবুর গুহা মুখ বন্ধ করে দেবার। সীতেশবাবু দ্বিরুক্তি না করে তার সঙ্গে চলে গেলেন।

নিশীথ নিজের ঘরে ফিরে এলো। একজন প্রহরী এসে তাকে জানাল, তার কোন কিছুর আবশ্যকতা আছে কি না।

তার চোখমুখ দেখেই নিশীথ বুঝতে পারলে অত্যন্ত মদ খেয়েছে সে,—এখন যেন ঘুমাতে পারলে বাঁচে। নিশীথ গম্ভীর ভাবে বললে, গুহার দরজাটা খানিকটা খুলে রেখো। একটু ঠাণ্ডা বাতাসের দরকার। ল্যাবরেটারীতে আজ গুরুতর পরিশ্রম হয়েছে। আদেশ মত কাজ করে প্রহরী টলতে টলতে চলে গেল।

নিশীথ ফ্লাস্ক খুলে এক কাপ দুধ খেয়ে নিলে, তারপর নৈশ-ভোজন শেষ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লে। গুহার গণ্ডগোল তখন সব থেমে গিয়েছে। একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। গুহামুখ ভেদ করে ম্লান জ্যোৎস্নার ক্ষীণ রেখা গুহার ভেতরে এসে পড়েছে। নিশীথ পা টিপে টিপে গুহা থেকে বাইরে এলো।

প্রত্যেক গুহার পাশে এসে ছিদ্র দিয়ে নিশীথ দেখতে পেলে সবাই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। ঐ বিরাট দেহী পুরুষটা বিকট শব্দে নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

নিখিল একটু হাসলে। যে পরিমাণ ঘুমের ঔষধ সে মিশিয়ে দিয়েছে মদের মধ্যে, এ ঘুম যে তাদের সহজে ভাঙ্গবে না তা সে বেশ বুঝতে পারলে।

সীতেশবাবুর গুহার মুখে এসে সঙ্কেত করতেই সীতেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন। গুহামুখ খুলতে যেয়েই নিশীথের মনে হল, আঁচিলওয়ালার কাছ থেকে চাবিটা আনা হয়নি। একটা শেকলের সঙ্গে পাথরটা বাঁধা, আর শেকলটা আটকানো রয়েছে তালা দিয়ে।

আঁচিলওয়ালার গুহার পাথর সরিয়ে সে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর অতি সন্তর্পণে তার কাছ থেকে চাবি তুলে নিল। তালা খুলে সীতেশবাবুকে বাইরে নিয়ে এলো নিশীথ। বাইরে তখন কন্‌কনে শীতের হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নিলেন তিনি। নিশীথ ফিস্ ফিস্ করে বলল, সবগুলো এখন অসাড়ে ঘুমুছে সীতেশবাবু। সকলকে সাবাড় করে দেবার এই চরম সুযোগ!

সীতেশবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ব্যস্ত হয়োনা নিশীথ। সেটা সম্ভবপর হবে না। সর্দ্দারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে ভেবেছ? এই যদি তোমার মনে ছিল তো সেদিন মৃত্যুদণ্ড দিলেই পারতে। পালের গোদা কয়েকটা কমতো। তোমাকেও দোষী মনে করতো না কেউ।

নিশীথ একটু লজ্জিত হয়ে বলল, কি জানি, ক্রমশঃ যেন মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে।

সীতেশবাবু সাহস দিয়ে বললেন, কোন চিন্তা নাই। ঘটনার প্রভাবেই আবার মনটা তোমার ঠিক হবে। আর দেরী করবার সময় নেই, চল ল্যাবরেটারীতে যাই।

দুজনে এসে গুহামুখের পাথর সরিয়ে ল্যাবরেটারীতে ঢুকে পড়লেন। সীতেশবাবু ঔষধ-পত্রের স্তূপ সরিয়ে একটা কালো বাক্স বের করলেন। তারপর পাথর কাটার একটা যন্ত্র বের করে গুহার এক দুর্ব্বল স্থানের পাথর খুঁড়ে ফেলতে লাগলেন।

একটা বড় গর্ত্ত করে তার ভেতরে কালো বাক্স থেকে একটা জিনিষ বের করে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রেখে দিলেন সেখানে। তারপর নিশীথকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন সর্দ্দারের ঘরে। সেখানেও চলল এই প্রক্রিয়া। পর পর পাঁচটা ঘরে এমনি ভাবে কাজ করে চললেন অত্যন্ত নিপুণ হস্তে। তারপর গুহার দেওয়ালের পাশ দিয়ে খুঁড়ে ইলেকট্রিকের তার ফেলে গর্ত্ত বন্ধ করে তিনি বাইরে নিয়ে গেলেন তার। বরফ খুঁড়ে সেই তার চলল পাহাড়ের গা বেয়ে অনেক দূরে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে চলছিল তাঁদের এই কাজ। এমনি নিপুণভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি যেন কোন খুঁত না থেকে যায়। কাজের নিপুণতা দেখে নিশীথের মনে হল একাজ যেন তাঁর নতুন নয়। চিরকাল ধরেই তিনি যেন এ কাজ করে আসছেন, তাই কোন জায়গায় অপটুতার কোন পরিচয় নেই। তার চলে গেল পাহাড় থেকে পাহাড়ান্তরে। অত্যন্ত পিচ্ছিল পথে চললো তাদের নৈশ-অভিযান; কিন্তু এ সব যেন সীতেশবাবুর নিত্য অভ্যস্ত ব্যাপার। নিশীথের প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হতে লাগল, যে কোন মুহূর্ত্তে পা পিছলে সে নীচে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু সে সব কিছুই ঘটল না।

সারারাত চলল তাদের এই অভিযান। ভোরের আলো ফুটে উঠবার আগেই তাঁদের কাজ সারা হলো। অত্যন্ত সতর্ক পদবিক্ষেপে তারা ফিরে এল। শীতে সমস্ত গা আড়ষ্ট হয়ে

গিয়েছে নিশীথের। এতক্ষণ কাজের উন্মাদনায় শীতটাকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি। সীতেশবাবুর গুহার মধ্যে ঢুকে আগুনে হাত পা ভালভাবে সেঁকে নিল সে। এতক্ষণ পরে যেন তার শরীরে রক্ত ফিরে এল।

নিশীথ এতক্ষণ একটা অদম্য কৌতূহল চেপে রেখে যন্ত্রচালিতের মত সীতেশবাবুর সাহায্য করে আসছিল। এখন আর সে কৌতূহল দমন করতে পারলে না। উৎসুক হয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, কি রেখে দিলেন সীতেশবাবু ঐ গুহার মধ্যে,—খুব বড় বোমা বুঝি ?

সীতেশবাবু মৃদু হেসে বললেন, এ সম্বন্ধে তোমার কৌতূহলটা খুব বেশী বলেই ব্যাপারটা এতদিন চেপে রাখতে হয়েছিল আমার। এখন আর তোমার কাছে গোপন রেখে লাভ নেই। বোমার চেয়েও অনেক শক্তিশালী জিনিষ এটা। এর একটাই পাহাড় উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

নিশীথ অবাক্ হয়ে বলে উঠলো, এটা কি তবে ডিনামাইট।

সীতেশবাবু হাসতে লাগলেন। সেই হাসির ভেতরই উত্তর পেলে নিশীথ। সীতেশবাবু গুহামুখের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললেন, ঐ দেখ ভোরের আলো ঢুকে পড়েছে গুহার মধ্যে। এখন আমার বন্দী হয়ে থাকার সময়। আর তাছাড়া আমার যা ঘুম পাচ্ছে এখন !

ছোট ছেলের মত কম্বল জড়িয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন।

নয়

নিশীথ একমনে ল্যাবরেটারীতে কাজ করছিল। এমনি সময় এক প্রহরী এসে জানালো সর্দ্দারের ঘরে তার ডাক পড়েছে। এখনই যেতে হবে তার। নিশীথ তার দিকে তাকিয়ে বলল, বলো সর্দ্দারকে হাতের এই কাজটা সেরেই আমি আসছি।

প্রহরী চলে গেল। সীতেশবাবু একটু মৃদু হেসে বললেন, হয়ত তোমার একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে নিশীথ। আজ সকালে ফিরে আসার পর থেকেই তোমার দেওয়া নোটগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করছে সে। খুসী হয়েছে নিশ্চয়।

নিশীথ চুপি চুপি বললে, আমাদের গোপন ব্যবস্থা প্রকাশ হয়ে যায়নি তো,—যেমন সন্ধানী চোখ সর্দ্দারের।

সীতেশবাবু হেসে বললেন, সে ব্যবস্থা আমি ভাল করেই করে রেখেছি। সহজে ধরা পড়ার ভয় নেই। তাছাড়া যা আবিষ্কার করে দিয়েছ তুমি ওদের, আজ বিকেল থেকেই দেখো আনন্দের হুল্লোড় বয়ে যাবে ওদের। কোন একটা অসৎকাজে সফলতা লাভ করলে মদের বোতল উজাড় করাই ওদের অভ্যাস। এ আমি বরাবর দেখে আসছি। ভালকথা, আমার নির্দ্দেশ মত সব ঠিক করে রেখে এসেছ তো? আর কিন্তু সুযোগ পাওয়া যাবে না। সর্দ্দারের চোখ কান কিন্তু অত্যন্ত সজাগ।

নিশীথ উত্তর দিলে, সে সব করা হয়ে গিয়েছে আমার।

সীতেশবাবু তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, তবে যাও, আর দেরী করো না, যা যা বলে দিয়েছি তেমনি ভাবে কথা বলবে সর্দ্দারের সঙ্গে। বিকেলে বেড়াতে যাবার অনুমতি নিতে ভুলো না যেন। আজই আমাদের পরীক্ষার দিন। একটা টেষ্ট-টিউব হাতে করেই যেয়ো। ভাবটা যেন অত্যন্ত কাজের ভেতর থেকেই তোমাকে টেনে আনা হয়েছে।

সীতেশবাবু হাসতে লাগলেন। নিশীথও একটু মুচকি হেসে একটা টেষ্ট-টিউব হাতে নিয়ে সর্দ্দারের গুহায় হাজির হল। সর্দ্দার এবার নিজে থেকেই একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে বস। নিশীথ অবাক্ হয়ে দেখলে, এবার কোন প্রহরী তাকে পাহারা দিয়ে রাখলো না। সর্দ্দার আতশী কাঁচ দিয়ে নোটগুলো পরীক্ষা করেই চলেছে দেখে নিশীথ বিরক্তির ভান করে বললে, আমার অনেক কাজ রয়েছে; তোমার এখানে বসে সময় নষ্ট করতে পারিনে আমি।

সর্দ্দারের মুখ হাসিতে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নোটখানা নিশীথের সামনে ধরে বললে, আমি ভেবেছিলুম যেমন বেয়াড়া বৈজ্ঞানিক তুমি, তোমাকে এ কাজে নামাতে বেগ পেতে হবে আমার। ঠাণ্ডা-ঘরের পরিণাম দেখেই বোধ হয় এতে রাজি হয়েছ।

নিশীথ দৃঢ় স্বরে বললে, সে ব্যবস্থা তুমি এখনও করতে পার

সর্দ্দার। এতে আমি ডরাইনে। মরতে তো হবেই মানুষকে। নিষ্ঠুরতা তো তোমার চির সঙ্গী।

সর্দ্দার কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, তবে আমাদের দলে যোগ দিলে কেন? হঠাৎ তোমার এ সুমতির কারণ?

নিশীথ ব্যঙ্গের সুরে বললে, সে তুমি কি বুঝবে সর্দ্দার। কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে নিশ্চেস্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ এমন একটা ল্যাবরেটারী যখন সামনে রয়েছে।

সর্দ্দারের চোখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল, সত্যিই এ ল্যাবরেটারীকে যতদূর সম্ভব ভাল করে তোলবার চেষ্টা করেছি আমি। এই জনহীন পাহাড়ে এর চেয়ে ভাল করা আর সম্ভবপর হয়নি। দুঃখের বিষয় এই ল্যাবরেটারী যার হাতে গড়া, সে আর ইহজগতে নেই। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে বিদায় নিতে হয়েছে।

নিশীথ বিদ্রূপ করে বললে, এমনি ভাবেই তোমরা বৈজ্ঞানিকের পরিশ্রমের মূল্য দাও, বিশ্বাস ঘাতকতার সন্দেহকে আশ্রয় করে।

সর্দ্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধমকের সুরে বলল, চুপ করে থাক তুমি। নাক টিপলে দুধ বেরোবে তোমার। এ বাচালতা তোমার মুখে প্রকাশ শোভা পায় না।

নিশীথ চুপ করে রইল। সর্দ্দার উঠে দাঁড়িয়ে একটা নোটের তাড়া বের করে নিশীথের সামনে ধরল। একটু হেসে বলল,

আজ আনন্দের দিনে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইনে। এটা দিলুম তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার। দশ হাজার টাকা আছে এতে, অবশ্য এর প্রত্যেকটাই আসল নোট।

নিশীথ তাচ্ছিল্যভরে বললে, টাকার লোভে একাজে নেমেছি এই যদি তুমি ভেবে থাক সর্দ্দার, তবে বলব এখানেও তুমি ভুল করছ। তোমার ঐ টাকাও আমি ঘৃণা করি।

সর্দ্দার গম্ভীর ভাবে বলল, তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার যখন দেব বলেছি তখন তোমায় নিতেই হবে। তোমার ইচ্ছা কি খুলে বলতো। মুক্তি ছাড়া তুমি আর কি চাও বলতে পার। এখন তোমায় মুক্তি দিতে পারবো না। আরো অনেক কাজ আছে তোমার এখানে।

নিশীথ হেসে বললে, সে আমি জানি সর্দ্দার। একবার যখন এসেছি এখানে, তখন মুক্তির আর কোন সম্ভাবনা নেই আমার। আর ভিক্ষা করে মুক্তি পাওয়া যায় না তোমার মত লোকের কাছ থেকে, এটাও ঠিক। তবে সত্যিই যদি কিছু করতে চাও তবে একটা কথা জানানো আবশ্যক মনে করি। সীতেশ বাবুকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছ। ল্যাবরেটারীর কাজে তাঁর সাহায্য আমার দরকার, স্থতরাং তোমাকে সেটা তুলে নিতে হবে।

সর্দ্দার গম্ভীর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আমার কথার নড়চড় হয় না। মৃত্যুদণ্ড তাকে পেতেই

হবে। অবশ্য যে কয়দিন তুমি তার সাহায্য পেতে চাও, সেই ক'দিন তাকে এ দণ্ড থেকে রেহাই দিতে পারি।

নিশীথ আশ্চর্য্যের ভান করে বললে, এ তোমার অন্যায় সর্দ্দার! সীতেশবাবুর সাহায্য না পেলে এ কাজে সফলকাম হতুম কি না সন্দেহ। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব করেছেন। অথচ তুমি তাকে ঠেলে ফেলছ মৃত্যুর পথে,—যেমন করে মেরে ফেলেছিলে এই ল্যাবরেটারী প্রতিষ্ঠাতাকে।

সর্দ্দার ধমক দিয়ে উঠল, অনধিকার চর্চ্চা বন্ধ রাখো নিশীথ। আমার বিচারের সমালোচনা করবার সাহসের পরিণাম কি ভাল-করে ভেবে কথা বলো।—কি স্পর্দ্ধা তোমার!

নিশীথ চুপ করে রইল। সর্দ্দার বলে উঠল, ঐ টেষ্ট-টিউব তুমি ল্যাবরেটারীতে রেখে এসো। আজ আর তোমাদের ল্যাবরেটারীতে কাজ করতে হবে না। তোমার এই ঔদ্ধত্যের বিচার হবে কাল। আজ আনন্দের দিন বলে ঘোষণা করেছি। আজ তোমরা স্বাধীন।

নিশীথ ব্যঙ্গভরে বললে, গুহার মধ্যে আটকে রেখে স্বাধীনতার তাৎপর্য্য কি বুঝতে পারিনে আমি।

সর্দ্দার হেসে উঠলো, যেখানে খুসী আজ তোমরা অবাধে বিচরণ করতে পারো। ল্যাবরেটারীর কাজে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছ দেখতে পাচ্ছি।

নিশীথ সায় দিয়ে বললে, সত্যিই তাই। এ কয়দিন অত্যন্ত পরিশ্রম গেছে আমাদের।

সর্দ্দার বলে উঠলো, সেই জন্যই মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে এসো খানিকটা। কিন্তু বাইরের পথ খুব খারাপ, অত্যন্ত সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। একজন গাইড দরকার হবে তোমার।

নিশীথ বললে, সীতেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হবে না?

সর্দ্দার কিছুক্ষণ ভেবে বললে, আচ্ছা দুই ঘণ্টা সময় দিলুম। এর মধ্যেই ফিরে আসতে হবে তোমাদের। এরা আজ যে পরিমাণে মঁদ চালিয়েছে, এদের দ্বারা কিছু হবে না দেখছি।

সর্দ্দার নিজে এক বোতল মদ নিয়ে খেতে সুরু করে দিল।

নিশীথ তাড়াতাড়ি ফিরে এলো ল্যাবরেটারীতে। সীতেশবাবু সব শুনে তাকে তৈরী হয়ে নিতে বললেন। শীতের উপযুক্ত পোষাক পরে পাহাড়ে বেড়ানোর আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা তৈরী হলেন। নিশীথ গবেষণার কাগজপত্র সব লুকিয়ে রাখলে পকেটে। কোন রকমে যদি ফিরে যেতে পারে, অধ্যাপক মশায়ের হাতে সেগুলো ফিরিয়ে দিয়ে নিষ্কলঙ্ক হতে হবে তাকে।

দুজনে সন্তর্পণে গুহা থেকে বের হতেই দেখতে পেলে আঁচিলওয়ালা অত্যন্ত মত্ত অবস্থায় তার গুহার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। নিশীথের মন বিরক্তিতে ভরে গেল। যাত্রার মুখে এই অলক্ষুণে লোকটাকে দেখে তার পিত্ত জ্বলে গেল। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তারা অগ্রসর হলো।

ক্ষিপ্রপদে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তারা অন্য পাহাড়ে চলে এলো। মাত্র দুই ঘণ্টা তাদের সময় দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ী-পথ অতিক্রম করতে অনেক সময় লাগে। দেড় ঘণ্টা সময় চলে গিয়েছে, এখনই তাদের তৈরী হয়ে নিতে হবে। নইলে বিশ্বাস-ঘাতকতার অজুহাতে সর্দ্দারের কি হুকুম হয়, তার ঠিক নেই। একে তো ঔদ্ধত্যের বিচারটা মুলতুবী রয়েছে তার। আর সীতেশবাবুর সামনে তো খাঁড়া ঝুলছেই।

একটা জায়গার বরফ খুঁড়ে তারা ব্যাটারী খুঁজে বের করে পরীক্ষা করে দেখলে সব ঠিকই আছে। এখন শুধু চার্জ্জ করার অপেক্ষা। সীতেশবাবু ক্ষিপ্রহস্তে সমস্ত কাজ সেরে নিচ্ছেন। নিশীথ জিজ্ঞেস করলে, আমাদের অজ্ঞান হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই তো সীতেশবাবু।

মৃদু হেসে জবাব দিলেন তিনি,—ডিনামাইটগুলোকে খুব শক্তিশালী করে তৈরী করা হয়েছে সুতরাং সারা পাহাড়ই কেঁপে উঠবে। তুমি শক্ত করে ঐ খুঁটিটার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখো চার্জ্জ করার আগে। তাহলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। শব্দ থেকে কান দুটোকে রক্ষা করতে হবে। ভাল করে বেঁধে ফেলো কান দুটোকে।

দুজনে কানের মধ্যে তুলো গুঁজে দিল। তার উপর পাথর চাপা দিয়ে ভাল করে কানটা জড়িয়ে নিল যেন কোন রকমেই বিস্ফোরণের শব্দ এসে তাদের কর্ণপটহ নষ্ট করে না দেয়।

সীতেশবাবু নিজেকে বরফের মধ্যে পোঁতা একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নেবার চেষ্টা করছেন, এমনি সময় দেখা গেল; কে যেন হুমড়ি খেয়ে তাঁর উপর পড়ল। নিশীথ সচকিত হয়ে দেখতে পেল, সেই আঁচিলওয়ালা। কি সর্ব্বনাশ! এ আপদটা এখানে এসে জুটলে কি করে? অত্যন্ত মত্ত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল সে গুহার দরজায়। ঐ অবস্থা নিয়ে এই পাহাড় বয়ে এলো কি করে? মত্ততা কি তার ভান। সর্দ্দার কি সব জানতে পেরেছে তাহলে। নিশীথ যেন ঘেমে উঠল।

তখন সীতেশবাবুর সঙ্গে তার প্রচণ্ড লড়াই চলছে। অন্য সময় হলে হয়ত প্রৌঢ় সীতেশবাবুকে কাবু করতে তার বেগ পেতে হত না, কিন্তু অত্যধিক মদের প্রভাবে তার দেহ হয়েছে শিথিল। তাই সীতেশবাবুকে কিছুতেই আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারছিল না। সীতেশবাবুও সুযোগ বুঝে তার বুকের উপর উঠে বসে দুহাতে ঘুসি চালাতে সুরু করে দিলেন।

নিশীথ কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে সেও ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরলে। উপায়ান্তর না দেখে আঁচিল-ওয়ালা একটা রিভলভার বের করে গুলি চালিয়ে দিল সীতেশবাবুকে লক্ষ্য করে। গুলিটা এসে লাগল সীতেশবাবুর বাঁ হাতে। ঝর ঝর করে রক্ত পড়ে জামা কম্বল ভিজে গেল। নিশীথ রিভলভার শুদ্ধ হাতটা জড়িয়ে ধরে বেপরোয়া গুলি চালাতে লাগলে তাকে। গুলিগুলো সব লাগল তার পায়ে।

আর্ত্তনাদ করে উঠল সে, তারপর একটা ছোরা বের করে নিশীথকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলে সে। কম্বল ভেদ করে তার খানিক বসে গেল নিশীথের হাতে। রক্তাক্ত হাত নিয়ে নিশীথ তাকে বেঁধে ফেলল তাড়াতাড়ি। সীতেশবাবু আহত অবস্থায় টলতে টলতে আবার ব্যাটারীর পাশে বসলেন। তারপরে চার্জ্জ সুরু করে দিলেন। পর পর পাঁচটা চার্জ্জ।

একটা ভীষণ শব্দে সমস্ত পাহাড়টা থরথর করে কেঁপে উঠল। নিশীথদের পাহাড়টাও কেঁপে উঠল প্রায় তেমনি ভাবে। প্রাণপণে খুঁটা ধরে নিশীথ আর সীতেশবাবু আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। আঁচিলওয়ালা গড়াতে গড়াতে সেই উঁচু পাহাড় থেকে কোন অতলতলে তাদের দৃষ্টির বাইরে পড়ে গেল। গুহাওয়ালা সমস্ত পাহাড়টাই যেন ধ্বসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এ পাহাড়টার খানিকটা অংশ ভেঙ্গে গহ্বরের সৃষ্টি হলো।

দুজনে নীরব হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। কাপড়ের পর্দ্দা ভেদ করে যেন সেই শব্দতরঙ্গ তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে একটা অসাড়তা সৃষ্টি করছিল। কারও মুখে কোন কথা নেই। সেই নির্জ্জন পর্ব্বতে আহত দুই বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের এই ধ্বংসকারী রূপ প্রত্যক্ষ করে নিশ্চল হয়ে বসেছিল।

সীতেশবাবু কম্বলের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেললেন। কাপড় দিয়ে হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লাগলেন। তখনও ক্ষতস্থান থেকে ক্ষীণ রক্তধারা বয়ে যাচ্ছিল। গুলিটা মাংসপেশী ভেদ করে এফোঁড়

ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। হাতটা নাড়াচাড়া করে তিনি বললেন, গুলিটা মাংসের উপর দিয়েই গিয়েছে এই রক্ষে। হাড়টার কিছু হয়নি। তারপর নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললেন, ছোরাটা কি অনেকখানি বিঁধেছে নিশীথ।

নিশীথ তখন কানের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলেছিল। একটু হেসে বললে, কম্বল আর পোষাক ভেদ করে কতটুকুই আর ঢুকবে সীতেশবাবু। তবে অনেকটা কেটে গেছে।

সীতেশবাবু হাঁফাতে স্থরু করে দিলেন, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি নিশীথ। তুমি ঔষধপত্র আর খাবারের বাক্সটা বরফ থেকে তুলে ফেল নিশীথ। আজ রাত আমাদের এখানেই কাটাতে হবে। হিংস্র কোন জন্তু দেখা যাবেনা আজ। এত উঁচুতে হয়ত তারা থাকে না, আর থাকলেও তারা পালিয়ে গেছে এতক্ষণ। এখন শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেলে বাঁচি। রাত্রি নেমে আসার আগেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিশীথ খাবারের বাক্স বের করলে, তারপর সীতেশবাবুর ও নিজের ক্ষতে ঔষধ লাগিয়ে দিলে। সীতেশবাবু মৃদু হেসে বললেন, এদের এই মলম ক্ষতের উপর চমৎকার কাজ করে; পাকতে দেয় না সহজে। তারপর সিরিঞ্জে ঔষধ পুরে নিজে ইনজেকসন নিলেন একটা। নিশীথকেও একটা দিয়ে বললেন, এখন চটপট করে একটা আশ্রয় স্থান তৈরী করে নাও। হাওয়া থেকে রক্ষা পাবার উপায় করতে হবে।

অনেক চেষ্টার পর বরফের একটা অস্থায়ী আবাস তৈরী করে ফেলল সে। তারপর খাবারের টিনগুলো কেটে খাওয়া সুরু করে দিলে দুজনে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। শীতের প্রবল প্রকোপে দুজনেই যেন জমে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে বরফের বাঁধন ডিঙ্গিয়ে কনকনে বাতাস শীতটাকে যেন আরও ঘনীভূত করে তুলছিল। ছোট একটা অক্সিজেনের সিলিণ্ডার নিয়ে এসেছিল নিশীথ গুহা থেকে। তারই মল খুলে তারা শ্বাসকষ্ট রোধ করে দেহের উষ্ণতা বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন।

রাতটা কাটল কোন রকমে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিশীথ বলে উঠল, ওদের গুহাটায় কি হলো দেখে আসি সীতেশবাবু।

সীতেশবাবু বাধা দিয়ে বললেন, অনর্থক সময় নষ্ট হবে নিশীথ। তার চেয়ে বরং চল পাহাড় থেকে নেমে পড়ি। কিছুটা পথ এগিয়ে যাওয়া যাবে এখন। এরপর তুষার ঝড় যদি নেমে আসে, পথেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

নিশীথ হেসে বললে, না হয় এখানেই কোন গুহা খুঁজে বের করে থেকে যাব। ওদের গুহা খুঁড়ে জিনিষপত্র বের করে নিয়ে এসে রবিনসন ক্রুশোর মত এই পাহাড় সমুদ্রের কোলেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে কয়েকদিন। ল্যাবরেটারীর কিছুটা জিনিষ পাওয়া গেলে তা নিয়েই সময় কাটবে আমাদের।

সীতেশবাবু হেসে বললেন, তরুণ কিনা তুমি, তাই মন হয়েছে অনেকটা কল্পনা-প্রবণ। বাস্তবের সঙ্গে ভাল করে পরিচয় এখনও তোমার ঘটেনি। বাস্তব বড় কঠিন জিনিষ নিশীথ। এই দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় সেটা বুঝতে শিখেছি। নিশীথ বললে, তাহোক চলুন, গুহাটা একবার দেখে আসতে ইচ্ছা হয়েছে আমার।

"চল তবে।" সীতেশবাবু বললেন।

দুজনে আবার অতি সন্তর্পণে চললেন পাহাড়ের গা বেয়ে। বিস্ফোরণের ফলে পথ হয়েছে অত্যন্ত দুর্গম। গুহা মুখের কাছে তারা পৌঁছতে পারলেন না। দূর থেকেই তারা দেখতে পেলেন সমস্ত গুহাগুলো যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সমস্ত পাহাড় যেন ভেঙ্গে চূরে পিণ্ডাকৃতি ধারণ করেছে। ধ্বংসের এই তাণ্ডব নৃত্য দেখে নিশীথ স্তব্ধ হয়ে রইল। সীতেশবাবু হেসে বললেন, রবিনসন ক্রুশোর মত এখান থেকে কিছু নেওয়া সম্ভবপর হবে না নিশীথ। ভেতরের সব জিনিষ চাপা পড়ে গুড়িয়ে গেছে।

নিশীথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, সর্দ্দারের দল সবই গিয়েছে তাহলে?

সীতেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ডিনামাইট সবাইকে সমাধি দিয়েছে নিশীথ। কেবলমাত্র আঁচিলওয়ালাটা তার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

নিশীথ বলে উঠল, সেও চাপা পড়েছে। গুলির আঘাত থেকে রক্ষা পেলেও হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে কোন্ পাহাড়ের তলে চাপা পড়ে অক্কা পেয়েছে তার ঠিক কি ?

সীতেশবাবু তেমনি ভাবে বললেন, খুব সম্ভব তাই। ঐ লোকটাই ছিল এদের দলে সবচেয়ে শয়তান। সর্দ্দারের ডান হাত বললেই হয়।

সর্দ্দারের কথা শুনে নিশীথের মনে পড়ল সীতেশবাবুর দণ্ডের কথা। একটু হেসে বললে, আজ আপনার শাস্তির দিন ছিল, —তাই নয় !

সীতেশবাবু একটু হেসে বললেন, অথচ এই শাস্তির মূল কারণটা কি তা তুমি জান না নিশীথ। সর্দ্দারের একটু পরিচয় জানতে পেরেছি এই ছিল আমার অপরাধ।

নিশীথ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কি সে পরিচয় ?

সীতেশবাবু বললেন, সর্দ্দার ছিল একজন চীনা ম্যান ! হঠাৎ একদিন অতর্কিত ভাবে আমি তার ঘরে ঢুকে পড়ি। মুখোসটা কি জানি কোন কারণে সে তখন খুলে ফেলেছিল।

আশ্চর্য্য হয়ে নিশীথ বলল, চীনা ম্যান ! অথচ এমন চমৎকার বাংলা বলতে পারত। আমার তো ধারণা হয়েছিল বাঙ্গালী।

সীতেশবাবু হেসে বললেন, এদের অধিকাংশই বিভিন্ন দেশের লোক। অথচ সবাই বাংলা বলতে পারত সুন্দরভাবে। সর্দ্দার ইংরাজীও বলতো ঠিক সাহেবদের মত। কেউ কারও

প্রকৃত নাম জানতো না। নামের বদল নম্বর ছিল এদের পরিচয়। এতো তুমি জান। যাক এখন এখান থেকে ফিরে যাই চল। সন্ধ্যার আগেই আর একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে আমাদের।

দুজনে আবার ফিরে এলেন। সমস্ত জিনিষপত্র বেঁধে ফেললেন তারা। সীতেশবাবু একটু হতাশ হয়ে বললেন, এত ভারী জিনিষপত্র নিয়ে পাহাড় থেকে নামা খুব কষ্ট হবে নিশীথ, বরঞ্চ এখানে কিছু রেখে যাই।

নিশীথ সাহস দিয়ে বললে, কোন চিন্তা করবেন না আপনি। একরকম করে নিয়ে যেতে হবে এসব।

সীতেশবাবু বললেন, সাবধানে চলবে নিশীথ, রাস্তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, দেখতে পাচ্ছ তো।

দু'জনে চলা সুরু করে দিলেন। কখন চড়াই, কখনো উৎরাই, এমনি ভাবে তারা নামা-উঠা সুরু করে দিলেন। মাঝপথে কিছু খাবার খেয়ে আবার পথ চলা সুরু হলো। সারাদিন এমনি ভাবে চলার পর বিকেলের দিকে একজায়গায় এসে উপস্থিত হয়ে সীতেশবাবু বললেন, আজ এখানেই রাত কাটাতে হবে আমাদের। নিশীথ চারিদিকে ভালকরে চেয়ে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠল, আরে, আমরা যেখান থেকে রওনা দিয়েছি, সেইখানেই যে এসে পড়লুম। ঐতো ওখানে ব্যাটারী চার্জ্জ করেছিলেন।

সীতেশবাবু সেদিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে বললেন, আমরা এই পাহাড়ী গোলক-ধাঁধায় পড়ে গেছি নিশীথ।

নিশীথের মুখে আর কথা ফুটল না।

দশ

প্রভাতের অরুণ আলো এসে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল নিশীথের। পাহাড়ের বাঁধন ডিঙ্গিয়ে এই রক্তাভ-আলো চারিদিকে বিকীরণ করে প্রকাণ্ড একটা লাল থালার মত আকাশ বেয়ে চলে আসছেন যেন সূর্য্যদেব। রশ্মিজাল যেন সমস্ত আকাশ রাঙিয়ে তুলে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে তাঁকে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে পড়ে তুষারে প্রতিফলিত হচ্ছে সে অপূর্ব্ব মাধুরীচ্ছটা। তুষার-কিরীট পাহাড়গুলো চক্‌চক্ করে উঠে যেন একটা সুন্দর কল্পনাপুরী সৃজন করে ফেলেছে। পাহাড়ের উপর পাহাড় চলেছে সমুদ্রের ঢেউএর মতো। বরফে ঢাকা রয়েছে তার প্রত্যেকটি শৃঙ্গ। আর তারই মধ্যে লুকোচুরি খেলছে যেন এই প্রভাতী সূর্য্যের রঙ্গিন আলো। নিশীথ মুগ্ধনেত্রে সূর্য্যোদয়ের এই অভিনব রূপ দেখতে লাগল। সে তার সব কষ্টের কথা ভুলে গেল। সমস্ত দুঃখ কষ্ট গ্লানির লেশমাত্রও রইল না তার মনে। একটা অনাবিল আনন্দে যেন তার হৃদয় জুড়ে গেল।

সীতেশবাবুকে ডেকে তুলল নিশীথ। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে বলে উঠল, কেমন সুন্দর হয়েছে আকাশটা দেখুন সীতেশবাবু। এই মধুর সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনি দিব্যি ঘুমিয়ে আছেন,—আচ্ছা বেরসিক তো আপনি! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন, নইলে শেষে সব ঢাকা পড়বে।

সীতেশবাবু উঠে বসে একটা হাই তুললেন। বেশীক্ষণ তিনি সৌন্দর্য্য দেখতে পেলেন না। মেঘ এসে সূর্য্যদেবকে লুকিয়ে ফেলল। নিশীথ উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, কেমন সুন্দর; আর একটু আগে উঠলে আরো ভাল দেখতে পারতেন। এই ঠাণ্ডায় আপনি আবার নাক ডাকিয়ে ঘুমানো সুরু করে দিয়েছেন!

সীতেশবাবু কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, তুমি টাইগার হিলের সূর্য্যোদয় দেখেছ নিশীথ?

নিশীথ বললে, পাহাড়ে আমার এই প্রথম আসা সীতেশবাবু।

সীতেশবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, সত্যিই সূর্য্যোদয় অত্যন্ত চমৎকার। টাইগার হিলে আমি সূর্য্যোদয় দেখেছি অনেকবার, কিন্তু আজ যা দেখলুম তার তুলনা হয় না। এই পাহাড়ের উঁচু তুষারময় চূড়ায় বসে সূর্য্যোলোকের জ্যোতির যে প্রথম বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়, তা সত্যিই অভিনব।

নিশীথ একটু দুঃখ করে বললে, মেঘে ঢাকা গেল হঠাৎ, নইলে আরো অনেকক্ষণ দেখা যেত এই সৌন্দর্য্যচ্ছটা।

সীতেশবাবু একটু হেসে বললেন, মানব জীবনে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ খুব কমই আসে নিশীথ। সে আনন্দ পেতে হলে তার জন্য সাধনা করা দরকার। আনন্দ হৃদয়ের জিনিষ, তার জন্য সত্যিকারের অনুভূতির আবশ্যক।

নিশীথ চুপ করে রইল। সীতেশবাবু বলে চললেন, হিমালয়ের এই যে বিরাট রূপ, এর দিকে চেয়ে দেখ, চোখ সার্থক হয়ে যাবে তোমার। মহাকবি কালিদাস এই নগাধিরাজকে পৃথিবীর মানদণ্ড রূপে কল্পনা করে গেছেন। কি মধুর কল্পনা ভেবে দেখ।

নিশীথ হঠাৎ বলে উঠল, আজ নিখিল এখানে থাকলে খুব ভাল হতো।

সীতেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, নিখিল কে।

"আমার বন্ধু, সাহিত্যিক সে। ওর কবি মন এ দৃশ্য দেখলে উথলে উঠত। কবিতার খাতায় ফুটে উঠত এর বিবরণ। কত ঠাট্টা করেছি ওর সাহিত্য নিয়ে বিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য। সাহিত্যের নিন্দা করলে ও বড় চটে যেত। আচ্ছা কোনটা দরকার বলুন তো, সাহিত্য না বিজ্ঞান? নিশীথ উৎসুক নেত্রে চেয়ে রইল সীতেশবাবুর দিকে।

সীতেশবাবু হেসে উঠলেন, তোমার প্রশ্ন সত্যি বড় অদ্ভুত নিশীথ। এ যেন জল আর বাতাস এ দুটোর কোনটা দরকারী এই কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। বেঁচে থাকতে গেলে জল আর

বায়ু দুটোরই যেমন চরম আবশ্যকতা রয়েছে, তেমনি সাহিত্য আর বিজ্ঞান—এ দুটোরই আমাদের দরকার। একের অভাবে অন্যের বিকাশ সম্ভব নয়। বেঁচে থাকতে হলে মানুষের দুটোরই আবশ্যকতা আছে।

নিশীথ সায় দিয়ে বললে, আমাদের অধ্যাপক মশায়ও সেই কথা বলেন, কিন্তু বিজ্ঞানের চর্চ্চাই আমার ভাল লাগে বেশী।

সীতেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন, এখন প্রাণ রক্ষার চর্চ্চাই করা দরকার নিশীথ। সামনে রয়েছে দুর্গম গিরি, তুষারের ঢেউ-এ ঢাকা। আমাদের এই পথ পাড়ি দিতে হবে। এই বরফের রাজ্য ছেড়ে যেতে পারলে হয়ত আমাদের আশ্রয় মিলবে। এ অভিযানের হবে সার্থকতা।

নিশীথ উত্তর দিল, লোকালয়ে পৌঁছতে না পারলে এর সার্থকতা কি হবে বুঝতে পারছিনে।

সীতেশবাবু বলে চললেন, হয়ত এ অভিযানের সার্থকতা এখন হবে না। কিন্তু আমাদের যদি এখানেই শেষ হয়, ভবিষ্যৎ-অভিযানকারীরা এসে পাবে আমাদের পরিচয়। আমাদের কঙ্কাল দেবে তার সাক্ষ্য। বিপদকে তারা তখন তুচ্ছ করবে। বার বার এই হিমালয় অভিযানের প্রচেষ্টা হয়েছে, এতো তোমার অজানা নয়।

নিশীথ চুপ করে রইল। সীতেশবাবু আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ঐ সুদূরে যে শৃঙ্গটি দেখতে পাচ্ছ, ঐটির নাম

এভারেষ্ট। এ পাহাড়ের আবিষ্কার করেছিলেন বাঙ্গালী বীর রাধানাথ শিকদার। দুর্ভাগ্যক্রমে পরাধীন দেশে রাধানাথ তাঁর যোগ্য সম্মান পান নি, কিন্তু বাঙ্গালী তাঁর কীর্ত্তির মহিমা ভুলতে পারে নি। বাঙ্গালীদের এই শৌর্য্য দীর্ঘ দিনের পরাধীনতায় চাপা পড়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে তারই দুই একটা অপূর্ব্ব বিকাশ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। এঁদের সুপ্ত শৌর্য্য যে আবার নবরূপে জাগ্রত হয়ে উঠবে, এবিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নাই।

নিশীথ বলে উঠল, এ যে কেবল বরফের রাজ্যই দেখতে পাচ্ছি সীতেশবাবু।

সীতেশবাবু কম্বল গুছিয়ে নিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও নিশীথ, পাহাড়ের নীচে যেতে যেতে পথে এর অমূল্য সম্পদের পরিচয় পাবে। এখন আমাদের এই চক্রব্যূহ এড়াতে হবে। অদ্ভুত এইস্থান। পাহাড়গুলোর সন্নিবেশ এমন আশ্চর্য্যভাবে এখানে হয়েছে যে, সারাদিন ঘুরে এই একই জায়গায় আসতে হয়েছে আমাদের। কাল একটা ভুল করেছি আমরা। সুগম পথের মায়া ত্যাগ করে দুর্গম পথ ধরেই আমাদের এগোতে হবে। দুর্গম পথ ধরেই আমাকে আসতে হয়েছিল এখানে। সুগম পথগুলো দেখি মরীচিকার কাজ করে চলছে এখানে।

দুজনে আবার তৈরী হয়ে নিল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময়

নিশীথ সীতেশবাবুর ক্ষতের অবস্থা অনেকটা দেখতে পেল। নিজেরটা অনেক কমে এসেছে। এমনিভাবে যদি কমে যেতে সুরু করে তাহলে অল্পদিনেই তারা নিরাময় হতে পারেন। সীতেশ বাবু বললেন, মলমটা কাজ দিয়েছে খুব। একে গুলির ঘা, তাতে বিশ্রাম পায় নি, সারতে অনেক সময় লাগবে।

আবার চলা সুরু হলো। দুজনেই পিঠে এখন ভারী বোঝা বেঁধে নিয়েছেন। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দুর্গম পথ অতিক্রম করে যেতে হলো। স্থানে স্থানে পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ আর তেমনি পিচ্ছিল। পা একটু ফস্কে গেলে একেবারে হাজার ফিট নীচে পড়ে যেতে হবে।

সীতেশবাবু বারবার সাবধান করে দিতে লাগলেন তাকে। পাহাড়ের অভিজ্ঞতা নিশীথের এই প্রথম। তার উপর এই বিপদসঙ্কুল পথ। পথ চলতে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছিল। কি করে যে এই পাহাড়-সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে সে যেতে পারবে—এ যেন সে ভেবেই ঠিক করতে পারছিল না। যন্ত্র-চালিতের ন্যায় সে সীতেশবাবুর অনুসরণ করে চলল। সীতেশবাবু তাকে ক্রমাগত সাহস দিতে লাগলেন। বিকেলের দিকে তারা সমতলভূমি পেয়ে সেখানেই বসে পড়লেন। নিশীথ বলে উঠল, আবার আমরা সেই জায়গায় ফিরে আসিনি তো!

সীতেশবাবু চারিদিক দেখে বললেন, না এবার আমার ভুল হয় নি। গোলকধাঁধার মায়া কাটিয়ে এসেছি আমরা। ঐ যে

পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ উপরে, ঐটায় ছিল আমাদের গুহা। বায়নাকুলার চোখে লাগিয়ে দেখ, অনেকটা বুঝতে পারবে।

নিশীথ অবাক্ হয়ে বললে, সারাদিন হেঁটে এইটুকু মাত্র এসেছি আমরা। ফিরে যেতে আমাদের দেখছি এক বছর লেগে যাবে।

সীতেশবাবু হেসে বললেন, পাহাড়গুলোর দূরত্ব বোঝা খুব কঠিন নিশীথ। অনেকটা পথ অতিক্রম করেছি আমরা। তাছাড়া আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে আসতে অনেক সময় লাগে। বরফে ঢাকা পথ, তাই চলতেও হয় খুব আস্তে। এতো আর তোমার কলকাতার চৌরঙ্গীর রাস্তা নয় যে, মোটর হাঁকিয়ে উড়ে বেড়াবে।

নিশীথ বায়নাকুলার দিয়ে দেখতে লাগল। খানিকটা দেখে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, পাহাড়টা ধ্বসে গেছে একেবারে; চারিদিকে বরফের ফাটল দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছে। যাবার সময় নগাধিরাজের গায়ে আঘাত দিয়ে গেলুম।

সীতেশবাবু হেসে বললেন, নগাধিরাজের দেহ রক্ত মাংসের নয়, কাজেই এ আঘাত সহ্য করতে কষ্ট হবে না তার। আপাততঃ রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আমরা ক্ষুধায় আকুল হয়ে পড়েছি, সুতরাং ব্যাগেজ খোল, ভার কিছু কমানো যাক্।

দুজনে মহানন্দে আহারে ব্যস্ত হলেন। গোলক-ধাঁধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সীতেশবাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। এই গোলক-ধাঁধার ভীষণতার কথা তিনি প্রায়ই শুনতেন গুহার

লোকজনের কাছে। এবার মনে হলো, তারপর দুরতিক্রম্য হলেও এগোতে বিশেষ বাধা থাকবে না আর।

নিশীথ মাখনের টিন কেটে নিয়ে খানিকটা মাখন বের করে নিলে। রুটীতে মাখন লাগিয়ে মুখে দেবার চেষ্টা করতেই একটা তীব্র শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠল। সীতেশবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, রিভলভার দুটোয় গুলি পুরে নাও নিশীথ। ভালুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এই দিকেই এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। হয়ত আমাদের দেখে থাকবে। ভীষণ হিংস্র-প্রকৃতি এদের।

রিভলভার আর গুলি বের করে সীতেশবাবুর হাতে দিয়ে নিশীথ বললে, এসব জিনিষের চর্চ্চা নেই আমার। আপনিই ঠিক করে দিন।

নিমেষের মধ্যেই গুলি পুরে ফেললেন সীতেশবাবু, তারপর নিশীথের হাতে একটা রিভলভার দিয়ে বললেন, সে কি নিশীথ! তোমার 'বুলডগ' তোমার গুলি খেয়েই'ত কাবু হয়ে পড়ল সেদিন।

নিশীথ বলে উঠল, উপায়ান্তর না দেখে ঘোড়া টিপেছি মাত্র, গুলিগুলো লেগেছে ওর পায়ে কিম্বা বরফের ঢিবিতে।

সীতেশবাবু একটু হেসে বললেন, ভাগ্যিস্ আমার গায়ে লাগেনি। তারপর গুলি ছুঁড়বার কায়দাটা শিখিয়ে দিয়ে বললেন, এ যন্ত্রটা হাতে থাকলেও অনেকটা সাহস থাকে। খালি হাতে তো ভালুকের সঙ্গে লড়াই করা চলে না।

ভালুকটা যেন ক্রমশঃ এদিকে এগিয়ে আসছে। সীতেশবাবু

নিশীথকে সঙ্গে নিয়ে সমতল ভূমির একাংশে উপস্থিত হলেন। উপরের পাহাড় বেয়ে কাঠবেড়ালীর মত ভালুকটা নেমে আসছে ক্ষিপ্রগতিতে। শিকারের সন্ধান পেয়েছে, আক্রমণের জন্য সারা গায়ের লোম ফুলিয়ে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে।

চিড়িয়াখানায় ভালুক দেখেছে নিশীথ। নাকে দড়ি দেওয়া পোষা ভালুকের নানা রকম নাচও দেখেছে। ভালুক যে একটা ভীষণ জীব এটা তার কোনদিন মনে হয় নি। নাকে দড়ি দেওয়া ভালুকের নিরীহভাব দেখে তার করুণার উদ্রেক হতো। কিন্তু এই বিপুলকায় মুক্ত ভালুকের চীৎকার আর আক্রমণের আতিশয্য দেখে তার হিংস্রতার পরিচয় পেতে নিশীথের বিলম্ব হল না। গুলি ছুড়তে সে মোটেই অভ্যস্ত নয়। কী যে কাণ্ড করে বসে ভালুকটা! কেবল মাত্র সীতেশবাবু আছেন এই যা ভরসা। কিন্তু তিনিও তো আহত। বাঁ হাতটা তাঁর নাড়বার উপায় নেই।

আশু বিপদের জন্য তৈরী হয়ে সমতল ভূমিতে পাহাড়ের অন্তরালে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন সীতেশবাবু আর নিশীথ। রিভলভার দুটো বাগিয়ে ধরে দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। ভীষণ গর্জ্জন করতে করতে ভালুকটা এসে দাঁড়ালে পাহাড়ের ধারে। তারপরই লাফ দিয়ে পড়ল সমতল ভূমিতে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই রিভলভার ছুঁড়লেন ভালুকটাকে লক্ষ্য করে। নিশীথের গুলি ফস্‌কে গেল, কিন্তু সীতেশবাবুর গুলি লাগল তার

পায়ে। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে সে নিশীথকে জাপটে ধরলে। রিভলভারটা নিশীথের হাত থেকে খুলে পড়ে তা থেকে একটা গুলি ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপরে দুজনে সুরু হল ভীষণ কুস্তি।

সীতেশবাবু পর পর গুলি ছুঁড়লেন ভালুকটাকে লক্ষ্য করে। সৈনিক পুরুষের শিক্ষিত হস্ত ব্যর্থ হলোনা।

সীতেশবাবু ধাক্কা দিয়ে মৃত ভালুকটাকে পাহাড়ের নীচে ফেলে দিলেন। বিরক্তি ভরে বললেন, অযথা এসে আমাদের খাওয়াটাকেই মাটি করে দিলে নিশীথ। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ফেল। আমাদের এখান থেকে উঠে অন্যত্র যেতে হবে। সন্ধ্যার আর ঘণ্টাখানেক মাত্র বাকী আছে। এর আগেই একটা নিরাপদ আস্তানা খুঁজে বের করতে হবে। আমরা বোধ হয় ভালুকের রাজত্বে এসে পড়েছি। ঐ শোন খুব দূরে একটা ভালুকের ডাক শোনা যাচ্ছে। ওটাও হয়ত এসে পড়তে পারে।

সীতেশবাবু রিভলভারে আবার গুলি পুরে নিলেন। তার পর সতর্ক অবস্থায় তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করে নিলেন। জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে বললেন, একটু এগিয়ে চলো নিশীথ, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে।

আবছা অন্ধকারে তারা আবার পথ চলা সুরু করলেন। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন তীব্রতর হয়ে উঠছিল। সীতেশবাবু চারিদিক তাকিয়ে বললেন, তুষার ঝড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে।

লক্ষণ তো সুবিধের নয়। বিপদের উপর বিপদ সুরু হলো। একবার সুরু হলে সহজে থামতে চায় না। আবার ভালুকের ডাক শোনা যাচ্ছে যেন। খুব সতর্ক ভাবে চলবে নিশীথ।

ঠাণ্ডা বাতাস তখন অত্যন্ত জোরে বইতে সুরু করে দিয়েছে। গায়ে যেন কাঁটার মত বিঁধছে। এই বাতাসের বেগ কাটিয়ে এগোনোও মুস্কিল। অথচ এই সঙ্কীর্ণ রাস্তায় থাকারও কোন উপায় নেই।

একটা ভালুক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে আসছিল সেই সঙ্কীর্ণ পথ ধরে। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই সীতেশবাবু থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝড়ের প্রকোপ তখন খুব তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। দুজনে সেখানে বসে পড়লেন। ঝড়ের বেগে যেকোন মুহূর্তে নীচে পড়ে যেতে পারেন তারা। পাহাড় গড়িয়ে গেছে অনেক নীচে। ভালুকটা হঠাৎ যেন পাশে মিলিয়ে গেল। সীতেশবাবু চারিদিক লক্ষ্য করে বললেন, এখান বোধহয় গুহা আছে একটা। ভালুকটা তার মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। আমাদের যেতে হলে ওর সমুখ দিয়েই যেতে হবে। তাতে ও রেহাই দেবে কি না জানিনে। হয়ত এই ঝড়ে আরও ভালুক রয়েছে সেখানে। এখন কি করবে নিশীথ ?

ভীত হয়ে নিশীথ বললে, এখান থেকে ফিরে যাই চলুন।

সীতেশবাবু কি যেন ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, ফেরার পথ তো সব দেখেই এসেছ নিশীথ। এই ঝড় আরও ভীষণ হয়ে

উঠবে। শাঁখের করাত ঝুলছে আমাদের সামনে। যে দিকে যাবে রক্ষা পাবার উপায় নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ চল ভালুকের গুহাতেই ঢুকে পড়ি। ভালুকগুলোকে যদি তাড়াতে পারা যায়, তবে একটা আশ্রয়ের সন্ধান মিলবে।

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অগ্রসর হলেন দুজনে। গুহামুখে এসেই পর পর গুলি ছুড়লেন তারা। দুটো ভালুক শুয়েছিল সেখানে। অতর্কিত আক্রমণে সচকিত হয়ে তারা গুহা থেকে বেরিয়ে এলো, তারপর যুগপৎ আক্রমণ করলে তাদের। পর পর গুলি ছুটে গেল তাদের দিকে। ভয় পেয়ে তারা পালিয়ে গেল অন্ধকারের আড়ালে। দুজনে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

অত্যন্ত অপরিসর সে গুহা। ছোট একটা পাথর ছিল। সেইটি গুহামুখে বসিয়ে সীতেশবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাক একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে এবার। কিন্তু ভালুক দুটো সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। পাথরটা অনায়াসে ফেলে দিয়েই ঢুকে পড়তে পারে, সুতরাং পালা করে ঘুমোবার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।

এগারো

বাইরে তখন প্রবল ঝড় চলছিল। দু'দিন ধরেই ঝড় সমান তালে চলেছে। এর যেন বিরতি নেই। সীতেশবাবু আর নিশীথ সেই সঙ্কীর্ণ গুহায় কোন মতে আত্মরক্ষা করে আসছিলেন। গুহার উপরের একটা অংশে ছোট একটা ফাটল ছিল। সেই ফাটল দিয়ে হুহু করে ঠাণ্ডা হাওয়া গুহার মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগল। কম্বলের ব্যূহ ভেদ করে সেই কনকনে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া তাদের রক্ত যেন জমাট করবার চেষ্টায় লেগে গেল। সীতেশবাবু আড়ষ্ট হয়ে বসে বললেন, গুহার ভেতরেই এত শীত, বাইরে রাত কাটাতে হলে ঝড় না থাকলেও শীতেই আমাদের দফা রফা হয়ে যেতো।

নিশীথ বিরক্তি ভরে বললে, ঝড়টাও আবার এমনি স্থুরু হয়েছে যে, থামবার নামটি নেই। সীতেশবাবু গুহা মুখে এসে পাথরের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বললেন, আকাশের যা অবস্থা দেখছি তাতে ঝড়টা শীগ্‌গিরই থেমে যাবে। ঝড় থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বের হয়ে পড়তে হবে। ভালুকের রাজ্য তাড়াতাড়ি ছাড়া দরকার আমাদের। তুমি তৈরী হবার ব্যবস্থা কর নিশীথ।

নিশীথ আহারের ব্যবস্থায় মনসংযোগ করলে। বিস্কুটের টিন

কাটতে কাটতে সে বললে, আমরা কি পথ ভুল করেছি সীতেশবাবু ? পদে পদেই বিপদ দেখছি। এই বিপদের মধ্যে ওরা যাতায়াত করতো কি করে ?

সীতেশবাবু একটু হাসলেন, কিন্তু জবাব দিলেন না।

ঘণ্টা খানেক পরে ঝড়টা থেমে গেল। সীতেশবাবু নিশীথকে সঙ্গে করে রওনা হলেন। আহারের জিনিষ সব প্রায় সব ফুরিয়ে এসেছে। এখনো অনেক পথ বাকী। এই স্বল্প খাদ্য সম্বল করেই তাদের এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

এমনিভাবে বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে আরও চারদিন কেটে গেল তাদের। দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে তারা দুজনই অধীর হয়ে উঠছিলেন। নিশীথের পা দুটো ভারী হয়ে উঠেছিল। এক হাতের উপর ক্রমাগত ভর দিয়ে নামবার প্রচেষ্টায় হাতের অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছিল। নিশীথ বিরক্তিভরে বললে, আমরা নিশ্চয় রাস্তা ভুল করেছি সীতেশবাবু। পথ এত ক্লান্তিকর হলে সর্দ্দার কখনই এমন ভাবে যাতায়াত করতে পারতো না।

সীতেশবাবুরও কেমন যেন একটা খটকা লেগেছিল। উত্তর দিলেন—সর্দ্দার ভিন্ন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতো কি না জানি নে। তবে আমাকে এই পথ দিয়েই আনা হয়েছে। আসবার সময় পথটা চিনে নেবার চেষ্টা করেছিলুম বলেই এই দুরূহ পথ এগিয়ে চলতে পারছি। কিন্তু আমারও যেন কেমন মনে হচ্ছে। পাহাড়ী-পথ চিনে চলা বড় মুস্কিল।

বিকেলের দিকে তারা আবার একটা সমতল ভূমিতে এসে পড়লেন। সীতেশবাবু উল্লসিত হয়ে বললেন, পথ আমরা ঠিকই চিনে এসেছি নিশীথ। এবার থেকে আমাদের পথটা ভয়ানক বিপজ্জনক। রাতটা আমাদের এখানেই কাটাতে হবে আজ। এখানে একটা আশ্রয় আছে। একরাত আমায় কাটিয়ে যেতে হয়েছে এখানে।

নিশীথ চারিদিকে চেয়ে হতাশ হয়ে বললে, এখান থেকে যাবার পথ কৈ সীতেশবাবু? সামনে খাড়া পাহাড়, নীচেও খাড়া পাহাড়। কোন্দিকে এগোবার উপায় নেই। তারপর নীচের দিকে চেয়ে বললে, কী নীচু দেখেছেন। একটা পথ আছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু নামবেন কি করে? পাহাড়টা এখানে একেবারে খাড়া দেখছি।

সীতেশবাবু হাসতে লাগলেন। তারপর একটা উঁচু জায়গার বরফ সরিয়ে বললেন, এই দেখ শেকল বাঁধা রয়েছে এখানে। মাঝে মাঝে রয়েছে কড়া। অনায়াসে এটা বয়ে নীচে নেমে যেতে পারা যাবে। দড়ি বেয়ে অনেক পথ তো নেমে এলে, আর এটা পারবে না। অবশ্য না পারলে অন্য ব্যবস্থা আছে।

নিশীথ হেসে বললে, বুড়ো মানুষ হয়ে আপনি ভাঙ্গা হাত নিয়ে দড়ি বেয়ে নামছেন, আর আমি পারবো না।

সীতেশবাবু একটা গুহা খুঁজে বের করলেন। গুহা মুখের পাথর সরিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। গুহার মধ্যে কিছু

শুকনো কাঠ ছিল। তাই জ্বালিয়ে নিয়ে হাত পা সেঁকে নিলেন তারা। সীতেশবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, এতক্ষণে মনে হচ্ছে শরীরে যেন রক্ত রয়েছে। এতদিন সেগুলো যেন জমাট বেধে ছিল।

আহারের স্বল্পতা দেখে নিশীথ বড় ক্ষুণ্ণ হলো। সীতেশবাবু হেসে বললেন, এই সম্বল নিয়ে চারদিন আমাদের পথ চলতে হবে। বিপদ আপদ্ দেখা দিলে দিনের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে, সুতরাং এ খেয়েই তোমায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে নিশীথ।

নিশীথ বিরক্তি প্রকাশ করে বললে, কিন্তু না খেয়ে পথ চলবো কি করে বলুন? জানেন তো আমার খোরাক কত!

সীতেশবাবু হেসে বললেন, কিন্তু সে খোরাক জোগাতে হলে আজই সব খাবার শেষ হয়ে যাবে। তোমার ঐ বুভুক্ষার বহর আপাততঃ মুলতুবি রাখ। নইলে ফিরে যাবার কোনই উপায় থাকবে না।

নিশীথ আক্ষেপ প্রকাশ করে বললে, আরও যদি কিছু খাবার আনতে পারতুম।

সীতেশবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার একবার যুদ্ধে যাওয়া দরকার নিশীথ। খাবার অভাবে অবরুদ্ধ সেনাদলের কষ্টের পরিচয় যদি তুমি পেতে, তা হলে তোমার বুভুক্ষা বিপদের মাত্রা বুঝে চলত।

নিশীথ গুহাটা ভাল ভাবে লক্ষ্য করে বললে, এই গুহাটায় ওরা এসে বিশ্রাম করতো। খাবারের সন্ধান হয়ত এখানে মিলতে পারে।

চারিদিকে সন্ধান করে হতাশ হয়ে সে বললে, না এরা শুধু কাঠই রেখে গেছে কিছু। খাবার সব সাবাড় করে দিয়েছে। এইটেই যদি মরুস্থান সাব্যস্ত করেছিল ওরা, তখন খাবার কেন রাখেনি ?

সীতেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, সে কথার জবাব দেবার লোক যখন পাবে না, তখন দিব্যি ঘুমিয়ে পড়। আঃ, যা আরাম বোধ হচ্ছে আমার ! কোন বিলাতী বড় হোটেলেও এমন আরাম পাইনি।

বিলেতের কথা শুনে নিশীথ কৌতূহলী হয়ে উঠল। আগ্রহের সঙ্গে সে বলে উঠল, বিলেতের গল্প বলুন সীতেশ বাবু। সারা রাত গল্প শুনেই কাটাব।

সীতেশবাবু হাই তুললেন। পাশ ফিরে বললেন, তোমার কৌতূহল আজ চরিতার্থ করা গেল না নিশীথ, আর একদিন শুনো এখন। ক্লান্ত শরীর আর বাধা মানছে না। শোবার আগে গুহা মুখের পাথরটা ভাল ভাবে আটকে রেখো।

পাথরটা গুহা মুখে চাপা দিয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে করতে নিশীথ ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন থেকে আবার তাদের যাত্রা সুরু হল বরফ গলা

পথ বেয়ে। পুরো দুদিন কেটে গেল এই বিপদ-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করতে। পথের ভয়াবহ রূপ দেখে নিশীথের মুখ শুকিয়ে গেল। এই দুই দিনের যাত্রায় তাদের শরীরের ওজন যেন অর্দ্ধেক কমে গেল! যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে তারা এই পথ অতিক্রম করতে পেরেছে। নিরাপদ স্থানে এসে নিশীথের মনে হল একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তারা। খাবার যা ছিল, সব ফুরিয়ে গেছে। এখনও দুদিনের পথ রয়েছে। অভুক্ত অবস্থাতেই পাড়ি দিতে হবে এই পথটা। পথে খাবার মিলবে কি না কে জানে?

সামনে রয়েছে পাহাড়, তারপর অরণ্যপথ। পাহাড়গুলি বেষ্টন করে রয়েছে এই বন। অনেক হিংস্র শ্বাপদ থাকে এই বনে। তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে তাদের পথ চলতে হবে। এতটা বিপজ্জনক পথ কাটিয়ে যখন আসতে পেরেছে, তখন বাকী পথটুকুও পারবে, এ ভরসা তাদের মনে হলো।

দূরে চারিদিকে দেখা দিল সবুজ বন। তার পাতার উপর বরফ পড়ে রয়েছে তুলোর আঁশের মত। বাতাসের সঙ্গে তুলোর আঁশের মত বরফ এসে লাগছে তাদের গায়ে। বরফ ঝেড়ে ফেলে তারা আবার রওনা হলো পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নিরাপদ স্থানের সন্ধানে।

পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণা ঝরছে। জলোচ্ছ্বাসের একটা প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। ঝরণার পাশে এসে সীতেশবাবু

বললেন, কেমন সুন্দর ঝরণা নিশীথ। ক্যামেরা থাকলে এর একটা ফটো নিতুম।

নিশীথ মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল সেটা। সীতেশবাবু বলে চললেন, এতবড় ঝরণাটা অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে এখানে। পাহাড় কেটে এখানে অনায়াসে সহর বসানো যায়। ঝরণাটা যে শুধু এ সহরের লোকের পানীয় যোগাবে তাই নয়—এর থেকে যে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাবে, তা দিয়ে বহু মিল চালানো যায়। আমাদের দেশ বড় গরীব নিশীথ। তাই পয়সা উপায়ের পন্থা আমাদের থেকেও নেই। এই ঝরণাগুলো দেশের ধন-ভাণ্ডারের সমৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে।

নিশীথ একটু চুপ করে থেকে বললে, সে-সব আস্তে আস্তে হয়ে যাবে সীতেশবাবু।

সীতেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, নিশ্চয়। প্রয়োজনের তাগিদেই এগুলোর সদ্ব্যবহার হবে। কিন্তু কবে যে সেই সুদিন আসবে ভাবছি। নগাধিরাজের এই স্নেহের দানের সদ্ব্যবহার যেদিন হবে, সেদিন থেকেই ভারতলক্ষ্মী হয়ে উঠবেন অচঞ্চলা।

নিশীথ সায় দিয়ে বললে, সে ঠিক।

সীতেশবাবু উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, এই যে বিপুল অরণ্যানী সমস্ত হিমালয়ের পাদদেশ বেষ্টন করে চলেছে, এতো ভারতের কম সম্পদের পরিচয় নয়। একে অবলম্বন করে ভারত সর্ব্বতোভাবে তার শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে। এই অরণ্য

থেকে ভারতের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। এই সোনার দেশে এত সম্পদ থাকা সত্বেও লোকে ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করে বেড়ায়। ভারতের এই বৃক্ষসম্পদ একটা গৌরবের বস্তু নিশীথ। পাহাড়ের এই সরস জমিতে কত প্রকার শস্য যে জন্মানো যায় তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা মাটীর আদর করতে পর্য্যন্ত শেখেনি, শিল্পের উন্নতি তো দূরের কথা।

সীতেশবাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন, শুধু চিন্তা করেই আমার জীবনটা কাটল নিশীথ, কিন্তু কোন কাজ করতে পারলুম না। অনেক ইচ্ছাই ছিল—কিন্তু কোনটাই সফল হলনা; শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেল সেগুলো। কি করবো আমি। দেশের লোক যে শ্রমবিমুখ! কেউ পরিশ্রম করতে চায় না। যাদের টাকা আছে, তারা সেটা খাটাতে চায় না। ব্যাঙ্কে রেখে সুদ পেলেই খুসী।

নিশীথ বললে, ঘটনাচক্রে হিমালয়ে এসে পড়ায় অনেক অভিজ্ঞতা হলো।

সীতেশবাবু বলে চললেন, আমরা প্রবীণ হয়ে পড়েছি নিশীথ। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার নোটিশ হয়ত এসে পড়বে শিগ্‌গির একদিন, কিন্তু তোমরা তরুণ; ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টায় তোমরা আত্মনিয়োগ করো। হয়ত এর সুযোগ আসবে তোমাদের কাছে।

নিশীথ সম্মতি জানিয়ে বললে, নিশ্চয় করবো।

সীতেশবাবু অগ্রসর হলেন। বললেন, একটু তাড়াতাড়ি চলো নিশীথ। আমাদের একটা থাকবার জায়গা খুঁজে নিতে হবে।

পথ চলতে চলতে বন এসে পড়ল। সেই বন ভেদ করেই তারা চলতে সুরু করে দিলেন। কিন্তু বিশ্রাম করার মত কোন স্থান পাওয়া গেল না সেই বনের মধ্যে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমে এলো। সীতেশবাবু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। বনের মাঝ থেকে কি যেন একটা শব্দ ভেসে আসছিল।

সীতেশবাবু তাড়াতাড়ি একটা বড় গাছের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি এই গাছে উঠে পড় নিশীথ। বড় একটা হাতীর দল এদিকে আসছে। নিশীথ তাড়াতাড়ি গাছের উপরে উঠে পড়ল। সীতেশবাবুও অতি কষ্টে গাছে উঠলেন। ভাঙ্গা হাতে আঘাত লেগে আবার রক্ত পড়তে সুরু হলো। ব্যাণ্ডেজটা আবার রক্তে ভেসে গেল। জিনিষপত্র সব গাছের নীচেই পড়ে রইল।

অন্ধকার তখন অনেকটা ঘনিয়ে এসেছে। হাতীর দল সেই গাছের তলায় এসে পড়ল এবং বোঝা দুটো চুরমার করে দিল। পায়ের চাপে অক্সিজেনের সিলিণ্ডারের মুখ খুলে যাওয়ায় শব্দ করে অক্সিজেনগুলো বেরিয়ে গেল। হাতীগুলো ভয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল। তারপর সেই ব্যাগেজ দুটোর উপর আক্রমণ

চালিয়ে বসল। শুঁড় দিয়ে ব্যাগেজ দুটা পর পর জড়িয়ে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সমস্ত জিনিষপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। নিশীথ রুদ্ধশ্বাসে বললে, ব্যাগেজ দুটো তুলে আনতে পারতুম। ভাল ভাল জিনিষগুলো সব নষ্ট করে দিলে।

সীতেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, রিভলভারটা সঙ্গে আছে তো ?

নিশীথ আর তাঁর কথা শুনবার মত সময় পেল না। হাতীরদল বোধহয় তাদের দেখতে পেয়েছে। তারা গাছের ডাল ভেঙ্গে ছুঁড়ে মারতে সুরু করে দিল।

সীতেশবাবু সাবধান করে বললেন, উঁচু ডালে উঠে বসো নিশীথ। একটা ডাল এসে গায়ে লাগলে হাড় ভেঙ্গে যাবে।

দুজনে একবারে মগডালে উঠে বসলেন। নিশীথ বিরক্তিভরে বললে, এই পাহাড়ে হাতী এলো কি করে ? আচ্ছা মুস্কিল সুরু করে দিয়েছে তো।

সীতেশবাবু উত্তর দিলেন, আমরা অনেক নীচে নেমে এসে পড়েছি নিশীথ। এখান থেকে আবার উঁচু পথে চলতে হবে আমাদের। এ পাহাড়টা বেশ ঢালু, তাই হাতীদের চলাফেরা করতে কোন কষ্ট হয় না।

হাতীর দল চলে গেল সেখান থেকে। নিশীথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, যাক বাঁচা গেল। ওরা সব দলবল নিয়ে চলে গেছে।

সীতেশবাবু নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন, বিপদের মাত্রা

আরও ভীষণ হবে নিশীথ। ভাল করে চেয়ে দেখ ওরা একটা পাহারা রেখে গিয়েছে। ডাল মেরে সুবিধে হলোনা দেখে ওরা অন্য উপায়ের সন্ধানে গিয়েছে। সহজে আমাদের ছেড়ে দেবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

হাতীটা চোরের মত দাঁড়িয়ে ছিল নিঃশব্দে। বেচারা ধারণা করেছিল, হয়ত সাড়াশব্দ না পেয়ে আরোহীরা নেমে আসবে, কিন্তু অনেকক্ষণ কাটানোর পরও যখন কোন সাড়া পেলে না, তখন সে মরিয়া হয়ে উঠল। দীর্ঘ শুঁড় তুলে সে গাছটার ডাল ভেঙ্গে আবার সেগুলো ছুঁড়তে সুরু করে দিলে। প্রতিবারই ডালগুলো অন্য ডালে লেগে ব্যাহত হয়ে ফিরে আসতে লাগল। অবশেষে সে শক্তি সঞ্চয় করে গাছটায় অতর্কিত ভাবে প্রবল একটা ধাক্কা দিল। সীতেশবাবু সে ধাক্কার বেগ সহ্য করতে না পেরে পড়বার উপক্রম করছিলেন। নিশীথ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তাঁর পতনোন্মুখ দেহকে টেনে ধরল। বেগটা সামলে নিয়ে সীতেশবাবু প্রাণপণ চেষ্টায় গাছ আঁকড়ে ধরলেন। তারপর চলল ধাক্কার উপর ধাক্কা। সতর্ক হয়ে থাকায় ধাক্কার বেগ তাঁরা সামলে নিলেন। সেই প্রকাণ্ড গাছটারও কোনই গুরুতর ক্ষতি সে করতে পারলো না। সীতেশবাবু বলে উঠলেন, এই সময় কোটটা খুলে ফেল নিশীথ। ওরা বোধহয় দল বেঁধে ধাক্কা দেওয়া সুরু করবে এবার। দলটা আবার এগিয়ে আসছে।

দুজনে গায়ের সার্ট খুলে ফেলে গাছের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে ফেললেন। ঝাঁকি যত জোরেই আসুক না কেন, পড়ে যাবার সম্ভাবনা তাদের নেই। নিশীথ জিজ্ঞেস করলে, আমাদের উপর ওদের এত রাগ হলো কি জন্য সীতেশবাবু। আমরা তো আর ওদের কোন অপকার করিনি।

সীতেশবাবু হেসে বললেন, একের কাজের ফল অন্যকে ভোগ করতে হয়। ওরা জানে মানুষের চেয়ে বড় শত্রু ওদের আর নেই। ওদের দলের অনেক হাতী হয়তো ধরা পড়েছে মানুষের হাতে। তাই মানুষ দেখলেই ওরা তেড়ে আসে। আর তা ছাড়া বনের জন্তু তো, পোষা হাতী নয় যে, মানুষ যা বলবে তাই মেনে চলবে। ওদের লক্ষ্যে যখন এসে পড়েছি তখন শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করবে মনে হচ্ছে।

নিশীথ বিরক্তিভরে বললে, দেখি ওদের বুদ্ধির দৌড় কত। গাছে তো আর চড়তে পারবে না। হয়রাণ হয়ে ফিরে যেতে হবে এদের। মাঝ থেকে মূল্যবান্ জিনিষপত্রগুলো সব নষ্ট করে দিলে।

সীতেশবাবু বলে উঠলেন, মূল্যবান্ জিনিষ সব গেছে বলে দুঃখ নেই। এখন ও-সব জিনিষ না পেলেও আমাদের চলবে। শুধু কম্বলগুলো ফিরে পেলে হয়।

নিশীথ কি যেন বলতে চাচ্ছিল। সীতেশবাবু কথা বলতে নিষেধ করায় সে চুপ করে রইল। হাতীর দল একটু পরেই

সেখানে এসে পড়ল। অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে তাদের সঞ্চরণশীল কালো কালো ছায়া ভয়ের সঞ্চার করে দিচ্ছিল।

হাতীগুলো শুঁড় থেকে জল বেয় করে গাছের গোড়ায় ফেলে দিল। অনেকটা জল জমে গেল সেখানে। তারপর সবলে গাছটায় ধাক্কা দিতে লাগল। কেউ গাছটাকে টেনে ধরল, কেউ তাকে ধাক্কা দিতে লাগল। তারপর পা দিয়ে ভিজে মাটি ঘসাতে স্বরু করে দিল। সীতেশবাবু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, যে রকম উঠে পড়ে লেগেছে ওরা, গাছটাকে হয়ত টেনে ফেলে দেবে মাটিতে। গাছ পড়বামাত্রই হাতীর দল আমাদের আক্রমণ করে বসবে, ঐ সময় যদি ছুটে পালাতে পারো নিশীথ, তবেই রক্ষে নচেৎ এই হিংস্র প্রাণীগুলোর হাতে রক্ষার আর কোন উপায়ই আমাদের নেই। দুটো রিভলভারে এতগুলো হাতীর আক্রমণ ঠেকানো সম্ভবপর হবে না।

নিশীথ বললে, কিন্তু যাই বলুন এরা মানুষের চেয়ে অনেক ভাল। মানব-দেহী যে অমানুষের পরিচয় আমরা পেয়ে এলুম, তাদের চেয়ে এরা অনেক ভাল।

সীতেশবাবু সায় দিয়ে বললেন, সে কথা ঠিক। মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু মানুষ। কাজেই তাদের সংযত রাখবার দরকার হয় কড়া আইনে।

আবার হাতীগুলোর অভিযান স্বরু হলো। গাছটা ধাক্কায় এক একবার হেলে পড়ে। আবার ছেড়ে দিলেই সোজা হয়ে

যায়। অবশেষে সকলেই শুঁড় লাগিয়ে টানতে স্থরু করে দিল।

সীতেশবাবু প্রমাদ গুনলেন। এতগুলো হাতীর শুঁড়ের আকর্ষণে গাছটা যে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, এ সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ রইল না।

হাতীর দল পর্য্যায়ক্রমে সারারাত ধরে এই নিষ্ঠুর অভিযান চালালো। কিন্তু গাছটা যেমন ছিল তেমনই রইলো। ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুণ্ণমনে হাতীর দল ধীর পদ-বিক্ষেপে চলে গেল।

আরো কিছুক্ষণ গাছে কাটিয়ে তারা দুজনে নেমে পড়লেন। ব্যাগেজের জিনিষপত্রগুলির কোনটাই তাদের কাজে লাগবে বলে মনে হলো না। নিশীথ ক্ষুণ্ণ মনে সীতেশবাবুকে বললে, এই দেখুন আমার ফরমূলার কি অবস্থা করেছে।

সীতেশবাবু চেয়ে দেখলেন, কাগজগুলো জলে ভিজে টুকরো টুকরো হয়ে পিণ্ডাকৃতি ধারণ করেছে।

অধ্যাপক মশায়ের গবেষণার খাতাখানা অনেকটা ভাল অবস্থায় পাওয়া গেল। পিণ্ডাকৃতি কাগজগুলো সব কুড়িয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, দেখা যাক এর পাঠোদ্ধার করা যায় কি না ?

বারো

সকাল থেকেই প্রচণ্ড বারিবর্ষণ সুরু হলো। জামা কাপড় সব ভিজে গেল। ছিন্ন ভিন্ন কম্বল বেয়ে জল ঝরতে লাগল। দুজনে বৃষ্টির মধ্যেই অরণ্যপথ অতিক্রম করে চলতে লাগলেন। এ পথটা পার হতে পারলে উঠতি-পথে পাওয়া যাবে পাহাড়। সেই পাহাড়ে লোকালয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। এখনও অরণ্যপথের অনেকটা বাকি। আজ রাতটা অরণ্যেই কাটাতে হবে তাদের। বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার কোন আশ্রয়ই এ ধারে মিলবে না। বৃষ্টিসিক্ত অবস্থায় তাঁরা অগ্রসর হলেন।

কিন্তু ক্ষুধায় অবসন্ন হলেন। খাবার ফুরিয়ে যাবার পর থেকে ঝরণার জল ছাড়া আর কিছু জোটেনি। এ অরণ্যপথ শেষ না হলে আহারের সন্ধান মিলবে কিনা সন্দেহ। বন ফলের সন্ধানে দুজনের চোখ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হতে লাগল।

সীতেশবাবুর শরীর যেন এলিয়ে পড়েছে। আজ দুদিন থেকেই তাঁর একটু জ্বর হচ্ছে। গুহার ঠাণ্ডাটা তাঁর যেন বেশী ভাবেই লেগেছিল। নিশীথ ব্যস্ত হয়ে উঠবে ভেবে কথাটা এতক্ষণ প্রকাশ করেননি তিনি। আজ এই জ্বর নিয়েই বৃষ্টিতে ভিজে চলেছেন। শীতে সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছিল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি অগ্রসর হলেন।

রাতটা কাটাতে হলো একটা গাছে উঠে। প্রতি মুহূর্তেই পড়ে যাবার আশঙ্কা করছিলেন তিনি। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই গাছ থেকে বহু কষ্টে নেমে গাছতলাতেই তিনি শুয়ে পড়লেন। নিখিল ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, কি হলো সীতেশবাবু! এমন করে শুয়ে পড়লেন কেন ?

সীতেশবাবুর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। অনেক কষ্টে তিনি বললেন, তুমি এগিয়ে যাও নিশীথ। এই পথে সোজা গেলেই পাহাড় পাবে। সেই পাহাড় বেয়ে খানিকটা গেলেই লোকালয়ের সন্ধান পাবে। অনেকটা পথ এখনও সামনে রয়েছে। তাড়াতাড়ি হাঁটলে হয়ত দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাবে।

নিশীথ উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনার কি খুব অসুখ করেছে সীতেশবাবু ?

সীতেশবাবু অতি কষ্টে বললেন, দুদিন হল আমার অসুখ হয়েছে। ও কিছু নয়, তুমি এগোও ; আমি একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার রওনা দেব।

এই সামান্য কয়টি কথা বলেই তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁফ ছাড়তে সুরু করলেন।

সমস্ত দেখে নিশীথ বললে, আপনার অসুখ খুব বেশী হয়েছে সীতেশবাবু। আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে আমি এক পাও নড়তে পারব না।

সীতেশবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, সে যাই হোক নিশীথ তুমি এখনি চলে যাও। আমি একটা ব্যবস্থা করবোই।

নিশীথ দৃঢ়ভাবে বললে, আপনাকে ফেলে আমি কিছুতেই যাব না। আপনাকে কাঁধে করেই আমায় এগোতে হবে। সে আমি অনায়াসে পারবো।

সীতেশবাবু হতাশ হয়ে বললেন, আমার বুকে পিঠে খুব ব্যথা নিশীথ, খুব সম্ভব নিমোনিয়া হয়েছে। আমার হয়তো এই শেষ। তুমি আর অনর্থক সময় নষ্ট করো না।

নিশীথ বললে, অসুখের মধ্যে এই বৃষ্টির জল গায়ে পড়েই আপনার এই অসুখ হলো সীতেশবাবু। ঔষধগুলো সব নষ্ট করে দিয়েছে। লোকালয়ে পৌঁছানোর আগে আপনাকে ঔষধ আর পথ্য কিছুই দিতে পারব না, এইটাই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ হয়ে রইলো।

উত্তরের কোন অপেক্ষা না করে নিশীথ ভেজা কম্বল দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে নিয়ে পিঠের উপর রেখে পথ চলতে সুরু করলে।

সীতেশবাবু তেমনি অবস্থায় থেকে প্রবল আপত্তি জানাতে সুরু করলেন। জ্বরের বেগ ক্রমশঃ বেশী হতে লাগল। শেষে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন তিনি।

দুর্ব্বল শরীর নিয়ে এই প্রকাণ্ড বোঝা বয়ে নিয়ে নিশীথ সেই বনপথ অতিক্রম করে চলল। কী যেন একটা অনিবার্য্য দুর্ব্বার শক্তি তার সেই দুর্ব্বল শরীরে প্রেরণা যোগাচ্ছিল।

যেমন করেই হোক তার এই দুর্দ্দিনের বন্ধুকে বাঁচাতেই হবে তাকে। প্রবল ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে পেটের ক্ষুধা আর শারীরিক দুর্ব্বলতা যেন তার ম্লান হয়ে এলো। এমনি ভাবেই মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে চলল সে। ক্রমে বন-পথ শেষ হয়ে এলো; বিজন বনও শেষ হলো। এখন পাহাড়ে উঠবার পালা। চারিদিকে সে চেয়ে দেখলে, কিন্তু লোকালয়ের কোন সন্ধানই দেখতে পেলে না। হয়ত কোন লোকালয় আছে পাহাড়ের উপরে। কিন্তু পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। নিজেরও কিছু আহার্য্যের সংস্থান করা দরকার। দেহের ক্লান্তির কথা ভাবলে চলবে না এখন। এই দুর্গম দুরূহ পথে সীতেশবাবু তাকে সবরকম বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। সীতেশবাবুকে আবার কাঁধে ফেলে সে পাহাড় বেয়ে উঠতে স্বরু করে দিল। সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। সন্ধ্যার আগেই তাকে আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবে।

তখনও তেমনি সমান তালে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ চলছিল। সমস্ত গা বেয়ে তার জল নেমে আসতে লাগল। শীতে তার ঠোঁট কালো হয়ে গেল। বৃষ্টি আর বাতাস এই দুইই যেন আজ উঠে পড়ে লেগেছে তাদের জব্দ করতে।

অত্যন্ত কষ্টে নিশীথ সেই ঝড়বাদল মাথায় করে সীতেশ বাবুকে বহন করে নিয়ে চলল। যে কোন মুহূর্ত্তে সে ভেঙ্গে পড়তে পারে। দুর্ব্বল দেহ প্রতিমুহূর্ত্তেই বিদ্রোহ করছিল।

নিশীথের ভয় হল সে যদি সংজ্ঞা হারিয়ে বসে। না, যেমন করেই হোক একটা আস্তানা খুঁজে বের করতেই হ'বে। ক্লান্ত শরীরকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্য সে সীতেশবাবুকে নামিয়ে রাখল।

সীতেশবাবু যেন কেমন হয়ে গেছেন। তাঁর জ্বর তপ্ত দেহ যেন ক্রমশঃ শীতল হয়ে আসছে। অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে নিশ্বাস নিচ্ছেন তিনি। নিশীথ তাঁকে ডেকে বললে, কেমন বোধ করছেন সীতেশবাবু।

তিনি চোখ মেলে চাইলেন। একটা হতাশার সুরে অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে বললেন, অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে আমার। শীগ্‌গির হয়তো সব শেষ হয়ে যাবে। আমাকে এখানে রেখে তুমি চলে যাও নিশীথ। এখনও এগিয়ে গেলে হয়ত একটা আশ্রয় খুঁজে পাবে।

নিশীথ অনুযোগের সঙ্গে বললে, কেন মনে ব্যথা দিচ্ছেন সীতেশবাবু। আপনাকে ফেলে আমি যেতে পারি, এ কল্পনা আপনি কি করে করেন, তাই ভাবছি। আপনাকে সুস্থ না করে কি করে আমি বিদায় হব বলুন।

সীতেশবাবু হাসলেন। অত্যন্ত ম্লান সে হাসি। রোগ যন্ত্রণায় তাঁর মুখ হয়ে উঠল বিকৃত। অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে তিনি বললেন, তোমার সে আশা বোধ হয় আর সফল হবে না নিশীথ। আমার বিদায় নেবার সময় হয়ে এসেছে। অত্যন্ত

শ্বাস-কষ্ট হচ্ছে। বুকে পিঠে অত্যন্ত ব্যথা। সম্ভবতঃ দুটো ফুসফুসই নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে।

নিশীথ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, নিমোনিয়া সন্দেহ করছেন কেন? ঠাণ্ডা লেগে ব্যথা হলেই নিমোনিয়া হবে কেন?

সীতেশবাবু বলে চললেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি নিশীথ আমাকে নিমোনিয়া ধরেছে। সময়ও হয়ে এসেছে। বারবার তোমায় বলছি আর অপেক্ষা না করে এগিয়ে যাও। তরুণ তুমি। তোমার সামনে রয়েছে বিপুল ভবিষ্যৎ। আমার জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার এখনই নেমে আসবে, তার আগেই তোমার পৌঁছনো দরকার।

অনেকগুলো কথা এক সঙ্গে বলে তিনি শ্বাস কষ্টে হাঁপাতে সুরু করে দিলেন। হঠাৎ যেন তাঁর মূর্চ্ছার ভাব হলো। কম্বল নিংড়ে খানিকটা জল নিয়ে নিশীথ তাঁর মুখে চোখে দিল। সীতেশবাবু আবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

নিশীথ জিজ্ঞেস করলে, এখন কি ভাল বোধ করছেন সীতেশবাবু?

সীতেশবাবু কোন কথার জবাব দিলেন না। একটা প্রবল শ্বাসকষ্টে তাঁর বুকটা যেন ফুলে ফুলে উঠছিল। নিশীথ ভয় পেয়ে গেল। তারপর আর অপেক্ষা না করে সীতেশবাবুকে আবার তেমনি করে পিঠে তুলে নিয়ে রওনা দিল।

বৃষ্টি তখন অনেকটা কমে এসেছে, কিন্তু ছাড়বার লক্ষণ

নেই। সে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের আঁকা বাঁকা সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে উঠতে লাগল।

পাহাড়ের একস্থানে রাস্তাটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। সীতেশবাবুকে বয়ে নিয়ে যেতে তার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। এক জায়গায় বৃষ্টিতে সেই রাস্তা গিয়েছে ধ্বসে। নিশীথ এসে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রমাদ গুনলে, খুব সমস্যায় পড়ে গেল সে। সুস্থাবস্থায়ও সেই ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে পথ চলা অসম্ভব; আর অসুস্থ শরীর নিয়ে সীতেশবাবুকে বহন করে এই বাধা ডিঙ্গিয়ে যায় কি করে? সীতেশবাবু যদি অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে পার হয়ে যেতে পারেন, তবেই রক্ষে। তাছাড়া আর কোন উপায় সে খুঁজে পেলে না। সীতেশবাবুকে পিঠ থেকে নামিয়ে তাঁকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তাঁর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অত্যন্ত ক্ষীণভাবে তাঁর শ্বাস বইতে সুরু করে দিয়েছে। নিশীথ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল। সীতেশ বাবুকে রক্ষা করার আর বুঝি কোন উপায়ই তার রইল না। ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করে সে অন্য কোন পথের সন্ধান পেলে না। অবশেষে সীতেশবাবুকে সেইখানে রেখে পাহাড়ের পাশ দিয়ে উপরে উঠে পথের সন্ধান করতে লাগলে।

খানিকটা পথ হামাগুড়ি দিয়ে উঠেই একটা কমলালেবুর গাছ সে দেখতে পেলে। অনেকগুলো পাকা লেবু রয়েছে তাতে। কয়েকটা পেড়ে আনলে সেখান থেকে। ক্ষুধার তাড়নায়

অনেকগুলো খেয়ে ফেললে সে; তারপর হাতের তেলোয় রস করে সীতেশ বাবুকে খাওয়ানো সুরু করে দিলে।

অন্ধকার হয়ে পশ্চিম আকাশে তখন মেঘ জমে উঠেছে, সম্ভবতঃ সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে। ঘনান্ধকার মেঘ সে আশু অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করার প্রচেষ্টায় লেগে গিয়েছে। হয়ত আবার ঝড় উঠবে। বর্ত্তমানের এই স্বল্প বারিবর্ষণ হয়ত ভবিষ্যৎ ঝঞ্ঝা বাদলের পূর্ব্বাভাস। এই বিপজ্জনক পথে দারুণ বিপত্তির মধ্যে যদি আবার ঘোরতর দৈব দুর্য্যোগের সম্মুখীন হতে হয় তাহলে তাদের এযাত্রা রক্ষা পাবার আর কোনই উপায় থাকবে না। সীতেশবাবুকে রক্ষা করা এক মহা সমস্যায় দাঁড়িয়ে গেল।

অতিকষ্টে সীতেশবাবু কমলার রস গলাধঃকরণ করতে লাগলেন। একটা নিরুপায়ের দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন নিশীথের মুখের দিকে। কোন কথা তাঁর মুখে ফুটল না। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু সে শুধু মুখ বিকৃত করাই সার হলো।

নিশীথ আবার তাঁকে পিঠে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল। অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিপজ্জনক সে পথ। একটু গড়িয়ে পড়লে হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যাবে দুজনের। অত্যন্ত সতর্কভাবে তাকে চলতে হলো। ভেজা জামার ঘর্ষণে সিক্তদেহ থেকে চামড়া উঠে গিয়ে একটা জ্বলুনি দেখা দিল। কিন্তু নিশীথের

সেদিকে লক্ষ্য নেই। একমনে সে এগোতে লাগল। খানিকটা উঠে সে আবার ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগলো তেমনি হামাগুড়ি দিয়ে। সীতেশবাবু নিশ্চল হয়ে রইলেন তার পিঠের উপর। বোধ করি তাঁর সংজ্ঞা লোপ পেয়েছিল। নিশীথ পিঠের উপর একটা মৃদু বক্ষস্পন্দন অনুভব করছিল মাত্র।

নিশীথ আবার রাস্তা ধরল। বাতাসের বেগ তখন অল্প অল্প দেখা দিয়েছে, অন্ধকারে পথ চলা মুস্কিল হয়ে পড়েছে। এক রকম হাতড়ে হাতড়ে পাহাড় বেয়ে সে অগ্রসর হল। রাতটুকু কাটানোর জন্য একটা আশ্রয়ের সন্ধান তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। প্রবল বেগে বৃষ্টি ও বাতাস সুরু হলো। বাইরে থাকবার মত অবস্থা আর আজ তাদের নেই।

দূরে একটা ক্ষীণ আলোর মত দেখে নিশীথের মনে আশার সঞ্চার হল। লোকালয়ের সন্ধান পাওয়া গেল তাহলে! নিশীথের মন চাঙ্গা হয়ে উঠল। আজ কোনমতে ঐ স্থানে পৌঁছতে পারলে নিশ্চিন্ত হবে তারা। সীতেশবাবুকে বাঁচিয়ে তোলবার একটি উপায় হবে তার। আহার জুটবে নিশ্চয়। নবীন উদ্যম এসে তার শরীরে যেন মত্ত হস্তীর শক্তি এনে দিল। নিশীথ এগোতে লাগল দৃঢ় পদবিক্ষেপে। ঝড় বৃষ্টির আগে তাকে ওখানে পৌঁছতেই হবে। সীতেশবাবুর দুর্ব্বহ বোঝা হালকা হয়ে গেল তার কাছে।

ঝড় বৃষ্টি প্রবল ভাবেই দেখা দিল। নিশীথকে যেন ঠেলে

ফেলে দিতে চাইল সে ঝড়। ঝড়ের প্রচণ্ডতা আরও বৃদ্ধি পেতে লাগল।

সামনে তাকিয়ে নিশীথ দেখলে আশ্রয়ের কাছাকাছি তারা এসে পড়েছে। আর একটু পথ গেলেই আশ্রয় মিলবে। কাঠের ঘর ভেদ করে আলোর রেখা ফুটে বেরোচ্ছে। সে রশ্মি দেখে নিশীথের মনে আশার আলো জেগে উঠল।

সীতেশবাবুর সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়েছে তার পিঠের উপর। হয়তো এখনও জীবন-প্রদীপের ক্ষীণ সলতে জ্বলছে।

নিশীথ আবার অগ্রসর হলো। ঝড়ের বেগ এসে তাকে পাহাড়ের নীচে ঠেলে ফেলে দেবার উপক্রম করলে। কোনক্রমে তা সামলে নিয়ে সে এগিয়ে চললো।

নিশীথ সেই পাহাড়ী কুটীরের পাশে এসে পড়ল এবং আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করলে। আর্ত্তনাদ শুনে কুটীরের দরজা খুলে গেল। দু'জন লোক বেরিয়ে এলো কুটীর থেকে আলোক-বর্ত্তিকা নিয়ে। নিশীথ সীতেশবাবুকে বহন করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

সীতেশবাবুকে অতি সন্তর্পণে কাঠের পাটাতনে নামিয়ে রাখল নিশীথ। তারপর তাঁকে সমতল জায়গায় শুইয়ে দিয়ে সেই মেঝের উপরেই বসে পড়ে গভীর ভাবে শ্বাস গ্রহণ করতে লাগল।

কে যেন খলখল করে হেসে উঠল পেছনে। নিশীথ চমকে

উঠে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে মুখটা তার ভাল দেখা যাচ্ছে না, অথচ হাসিটা যেন পরিচিত। ভাল করে চোখ রগড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল, এ সেই আঁচিলওয়ালা ! সে যে এখানে সশরীরে কি করে এলো এটা নিশীথ মোটেই বুঝে উঠতে পারল না। কি কঠিন প্রাণ ! কি করে সে আহত অবস্থায় এখানে এলো ? এসব ভৌতিক কাণ্ড নয় তো ?

আঁচিলওয়ালা হাসতে লাগল তেমনি ভাবে, তারপর হাসি থামিয়ে নিয়ে বললে, ভেবেছ, আমরা মরে গছি। —কেমন ? তারপর সীতেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, ওটা মরে গেছে নাকি !

নিশীথ হতভম্বের মত হয়ে গিয়েছিল। একটু সামলে নিয়ে বললে, না খুব অসুখ হয়েছে এঁর। তাই পিঠে করে আনতে হয়েছে। তারপর একটু অনুনয় করে বললে, এঁর একটা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে পার তিন নম্বর।

তিন নম্বর ! আঁচিলওয়ালা একটু চমকে উঠলো, একটু পরে সে বললে, হঁ, চিকিৎসা একটা করতে হবে বৈ কি ? তোমাদের শরীর টুকুরো টুকরো করে কেটে ফেলতে হবে আমায়, কিন্তু তার আগে বাঁচিয়ে তোলা দরকার।—কি হয়েছে ওর ?

আঁচিলওয়ালা একটা লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে এলো। তারপর সীতেশবাবুকে দেখে বললে, এর যে ডবল নিমোনিয়া হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। বুকটা দেখতে হবে ভাল করে।

লোক দুজনাকে ডাকলে সে। নিশীথ দেখতে পেলে দু'জন

ঠিক দু'রকম, একজন লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড জোয়ান আর একজন বেঁটে ও ক্ষীণকায়। যেন অনেক লোকের মাঝ থেকে এই দুই বিভিন্ন অবয়বের লোক বেছে নেওয়া হয়েছে।

আঁচিলওয়ালা হুকুম করলে, এই দুটোকে পাশের ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও, আমি ঔষধ নিয়ে আসছি।

লোক দুটো তাদের পাশের ঘরে নিয়ে গেল। একটু পরেই একটা ষ্টেথেস্কোপ আর ঔষধের পুঁটুলি নিয়ে লাঠি ভর করে আঁচিলওয়ালা এসে উপস্থিত হলো সেখানে। তারপর তাদের ইনজেকসন দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

নিশীথ জিজ্ঞেস করলে, কি অসুখ হয়েছে এঁর।

কর্কশকণ্ঠে সে জবাব দিলে, সে খবরে তোমার দরকার কি? নির্ব্বিচারে গুলি চালিয়েছিলে তখন আমার উপর। ভেবেছিলে মরে গিয়েছি,—নয়। তোমাদের মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলব বলে বাঁচতে হয়েছে আমায়।

নিশীথ কৌতূহলী হলে জিজ্ঞেস করলে, কি করে বেঁচে উঠলে তুমি।

তেমনি কর্কশকণ্ঠে সে বললে, "বরফ স্তূপের আড়ালে পড়েছিলুম বলেই রক্ষে পেয়েছি সেযাত্রা। এরা ভাগ্যিস গিয়েছিল, নইলে সেখানেই শেষ হতে হতো আমার! এর প্রতিশোধ ভাল করেই নিতে হবে আমায়। এই শয়তানটা ভাল হয়ে উঠুক আগে।" সীতেশবাবুর দিকে সে আঙ্গুল দিয়ে নির্দ্দেশ করল।

নিশীথ জিজ্ঞেস করলে কি করে তুমি আমাদের আগেই এসে উপস্থিত হলে ?

ধমক দিয়ে সে বলে উঠল, সে খবরে তোমাদের দরকার কি ? বেশী বাচালতা ভাল নয়। এক ঘুঁসিতে দাঁত সব উপড়ে দেবো।

জোয়ান লোকটার দিকে তাকিয়ে সে বললে, একে ভাল করে বেঁধে রাখবি, যেন পালিয়ে যেতে না পারে। এদের টুকরো করে কেটে ফেলব যে দিন সে দিন আমার রাগ যাবে।

জোয়ান লোকটা একটা দড়ি দিয়ে বেশ শক্ত করে নিশীথকে বেঁধে ফেললে। আঁচিলওয়ালা হেসে বললে, তোদের অপেক্ষায় এখানে ছিলুম। তোদের ব্যবস্থা একটা না করে আমি আর সরছিনে। পায়ের ঘাও এর মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

আঁচিলওয়ালা আবার লাঠিতে ভরে করে চলে যাচ্ছিল। নিশীথ জিজ্ঞেস করলে, "কিছু খাবার দিতে পার তিন নম্বর। বড় ক্ষিধে পেয়েছে আমার।" আঁচিলওয়ালা কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

একটু পরে একখণ্ড পোড়ারুটী আর পচা মাখন এনে দিয়ে গেল বেঁটে লোকটা। গন্ধে নিশীথের বমির ভাব হল, কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় তার সবটাই খেয়ে ফেললে সে।

দরজায় তালা লাগিয়ে দিলে তারা বাইরে থেকে। নূতন বিপদের সম্ভাবনায় নিশীথ আবার চিন্তিত হয়ে পড়ল।

তেরো

সীতেশবাবু নিরাময় হয়ে উঠেছেন। ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে পারেন। নিশীথের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। দুজনাই বন্দী অবস্থায় রয়েছেন ঘরের মধ্যে। অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে তাদের উপর। সীতেশবাবুর হাতের ক্ষতও সেরে গিয়েছে প্রায়। কী যে যমে মানুষে যুদ্ধ চলল এ কয়দিন। সীতেশবাবু যে এ যাত্রা রক্ষা পাবেন এ ধারণা কারো ছিল না। নিশীথ দেখলে আঁচিলওয়ালা শয়তান হলেও ডাক্তারী বিদ্যেটা তার ভাল ভাবেই জানা আছে।

কবে তাদের বিচারের দিন এসে তাদের টুক্‌রো টুকরো করে ফেলা হবে নিশীথ এটা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারল না। এই সুদূর জনহীন প্রান্তরে তাদের রক্ষা পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়।

সীতেশবাবু ঘরের মধ্যে পায়চারী সুরু করে দিলেন। নিশীথ বলে উঠল, আমাদের নিয়ে ওরা যেন মুরগী পোষা সুরু করে দিয়েছে সীতেশবাবু। রক্ষা পাবার কোন উপায় এখনো ভেবে ঠিক করুন। এখান থেকে লোকালয় কতদূর ?

সীতেশবাবু কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, সহজে আমরা যে ছাড়া পাব এ ভরসা আমার হচ্ছে না। রাগ যে ওদের প্রচণ্ড

রয়েছে এটা স্বাভাবিক। নিষ্ঠুরতার চরম বিকাশে ওদের রাগ শান্ত হবে। কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে ঠিক পাইনে কিছুতে, ওরা যদি আমাদের মেরেই ফেলতে চায় তবে আবার এমনভাবে বাঁচালে কেন ?

নিশীথ বলে উঠল, হয়ত নিষ্ঠুরতার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের জানিয়ে দিতে চায়। সীতেশবাবু অসম্মতি জানিয়ে বললেন, ঠিক বোধ হয় তা নয় নিশীথ, আমার মনে হয় আরও কোন গভীর মতলব আছে ওদের। হয়ত সর্দ্দারের ব্যবসাটা ও নিজের হাতে নিতে চায়। তুমি একটু প্রস্তাব করে দেখ না নিশীথ। ওদের ব্যবসায় আমরা যোগ দেব কিন্তু বেশী অংশ আমাদের দিতে হবে।

নিশীথ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, আপনি কি সত্যিই এই হীন কাজে যোগ দিতে চান ? সীতেশবাবু একটু হেসে বললেন, চাণক্য পণ্ডিতের মত ছিল এই ; কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। ভাবগতিক যা দেখছি তাতে এ বিষয় একটু সুফল পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এমনভাবে কথাটা পাড়তে হবে যাতে ওদের সন্দেহের কোন কারণ না ঘটে।

নিশীথ প্রস্তাব করলে, কোনরকমে পালিয়ে যেতে পারা যায় না সীতেশবাবু।

সীতেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, লোকালয় অবশ্য এখান থেকে বহুদূর নয়, কিন্তু পালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে না।

বিশেষতঃ আমরা এখন নিরস্ত্র। আমার শরীরও অত্যন্ত দুর্ব্বল রয়েছে। নড়াচড়া করার শক্তিই আমার নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য এখন তুমি যেতে পার। পরে আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি।

নিশীথ দৃঢ়ভাবে বলল, আপনাকে ফেলে এক পা নড়ব না আমি। সীতেশবাবু একটু হেসে বললেন, সে আমি জানি নিশীথ, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তোমাকে আর জড়ানো সমীচীন হবে না।

নিশীথ বিরক্তভাবে বললে, বুলডগটার কচ্ছপের প্রাণ। কি করে যে ওটা আমাদের আগে এসে পথ আগলে রইল, এ আমি ভেবেই ঠিক করতে পারছি না।

সীতেশবাবু বলে উঠলেন, একটা সংক্ষিপ্ত পথ রয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু সে পথটা আমি জানিনে। আর সেই পথ দিয়েই দুটো লোক গিয়ে একে খুঁজে পেয়ে আবার সেই পথেই আমাদের আগে ফিরে এসেছে। এখানকার এই আস্তানাটা ওদের নিজেরই। এটা আমি জানতুম। আমার জ্ঞান ছিল না, নইলে এখানে আশ্রয় নেবার পরামর্শ দিতুম না।

নিশীথ দুঃখ করে বললে, তখন যা অবস্থা হয়েছিল আমাদের। ভাগ্যিস্ এই আশ্রয়টা পেয়েছিলুম। নইলে পথেই শেষ হয়ে যেতুম।

সীতেশবাবু বললেন, এটা ওদের বিশ্রামকুঞ্জ নিশীথ; দীর্ঘ

পথের ক্লান্তি দূর করে নেবার জায়গা। আর তাছাড়া চোরাই আফিম এসে এখানেই আশ্রয় পায় প্রথম। এখন হয়ত এখানে আর নেই। এরা আফিমের অভাব খুব অনুভব করছিল বলেই জালনোটের ব্যবসার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল। সর্দ্দারটা সোজা লোক নয় ত।

নিশীথ জিজ্ঞাসা করলে, সেই চীনাম্যানটা এদের পালের গোদা হল কি করে?

সীতেশবাবু বললেন, একথার উত্তর দিতে পারলুম না। দলের কথা খুবই কম জানা যায় এদের কাছে। এতদিন রইলুম ওদের আড্ডায় কিন্তু কারো নামই জানিনে আমি। নম্বরই ছিল ওদের পরিচয়। সর্দ্দারের আদেশে এরা কলের পুতুলের মত চলত। সর্দ্দারকে এরা খুব মেনে চলে। তাই আমি ভাবছি এতবড় ক্ষতির একটা প্রতিশোধ হয়ত এরা নেবেই। অথচ কি ভাবে যে রক্ষা পাওয়া যাবে তার কোন সমাধান হচ্ছে না। এই তিন নম্বর বুলডগটাই হচ্ছে সবচেয়ে ধূর্ত্ত আর আর শয়তান। তাই এ যেন মরেও বেঁচে উঠলো আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য।

নিশীথ কি যেন বলতে যাচ্ছিল। সীতেশবাবু ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন তাকে। আঁচিলওয়ালা দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। এখন সে বেশ হাঁটতে পারে। পায়ের ঘা তার শুকিয়ে গেছে। কর্কশকণ্ঠে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে,

তোমাদের কি শল্লা পরামর্শ হচ্ছিল ? পালিয়ে যাবার মতলব হচ্ছে বুঝি ?

নিশীথ দৃঢ়ভাবে বললে, সে ইচ্ছে থাকলে আগেই হয়ত পারতুম তিন নম্বর। তোমার কথার জন্য অপেক্ষা করতে হত না। আমরা ঠিক করলুম, তোমাদের দলেই যোগ দেব। জালনোটের ব্যবসা আমরা অনায়াসে চালাতে পারি এখন। তবে তার আগে একটা ভাগ বখরার বন্দোবস্ত করতে চাই তোমার সঙ্গে। আধাআধি ভাগ যদি দিতে পার, তবে আমরা রাজী হতে পারি।

অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে সে বললে, তাতে আমাদের লাভ ! নোট চালাব আমরা, কমিশনেই যাবে অর্দ্ধেক। তাহলে আমাদের কি থাকবে ? লাভের সবটুকুই ত তোমাদের রইল।

নিশীথ কিছুক্ষণ ভেবে বললে, খরচ যা হবে সেটা দুভাগেই পড়বে। খরচ বাদে টাকা ভাগ করে নেবো আমরা।

তার মুখ যেন উজ্জ্বল হলো এ কথায়। কিছুক্ষণ ভেবে সে বললে, তোমরা তো আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। তোমাদের আবার ভাগ দিতে যাবো কোন দুঃখে। আমি যা হুকুম করবো তাই তোমাদের মেনে চলতে হবে।

নিশীথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, এটা তোমার বোঝার ভুল তিন নম্বর। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আমাকে কাজে লাগাতে পারবে না। তোমাদের সর্দ্দার পারেনি আমাকে কাজে

লাগাতে আর তুমি সাহস করছ! ভেবেছ মেরে ফেলবে এই ভয়েই আমি রাজী হব তোমার কথায়। তাহলে মেরে ফেলার বন্দোবস্তই তোমায় করতে হবে। কিন্তু তাতে তোমার লাভ কি? লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন তো করতে পারবে না।

তিন নম্বর গুম হয়ে বসে রইল। নিশীথের কথাগুলো তার মনে ধরেছে। নিশীথ বলতে লাগল, তাছাড়া মনে রেখো, আমার কাছ থেকে উপকারই পেয়ে এসেছ তুমি। সর্দ্দার তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। আমি ইচ্ছা করলেই মেরে ফেলতে পারতুম সেদিন, আর সে ইচ্ছা হওয়াটা আমার স্বাভাবিক ছিল। কারণ তুমি সেদিন কম অত্যাচার করনি আমার ওপর। এখন বাগে পেয়ে টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে হচ্ছে বটে, কিন্তু ভেবে দেখো সেদিন আমিই তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি।

তিন নম্বর যেন একটু নরম হল। মোলায়েম সুরে সে বলল, সে আমি জানি; কিন্তু বখরার মাত্রাটা খুব বেশী বলে মনে হচ্ছে। এতে অনেক টাকা লাভ হবে। দু আনার বেশী অংশ আমি দিতে পারব না। এতে তুমি রাজী কি না বল।

নিশীথ ভাববার ভান করে বলল, না তিন নম্বর অন্ততঃ সিকি দিতে হবে আমাদের দুজনকে। এর কমে আমি রাজী হব না। তুমি কথাটা বেশ করে ভেবে আমায় জানিয়ো। মত না হলে তোমাদের যা ইচ্ছে করো, আমাকে বিরক্ত করতে এসো না এর পরে।

তিন নম্বর বলে উঠল, তুমি তো বলেই খালাস, কিন্তু অসুবিধার কথা কিছুই ভাবছ না। আমি রাজী হতে পারি, কিন্তু এরা দুজন রাজী হবে বলে মনে হচ্ছে না। দুর্জ্জয় গোঁ ধরেছে—সর্দ্দারের হত্যার প্রতিশোধ নেবে। তোমরা আমাদের সাজানো বাগান চূরমার করে দিয়ে এসেছ। সমস্ত গায়ের চামড়া ছিঁড়ে ফেললেও তোমাদের উপর আমাদের রাগ যাবে না।

জিঘাংসার প্রেরণায় তার চোখ দুটোয় অস্বাভাবিক দীপ্তি প্রকাশ পেল। নিশীথ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, এদের তুমি বুঝিয়ে বললেই এরা মেনে নেবে। এমন লাভের ব্যবসাটা কি নষ্ট করা সঙ্গত হবে? আর তাছাড়া এদেরও লাভের আশা আছে। যা হয়ে গিয়েছে তার তো আর চারা নেই। আমাদের মেরে ফেললেই কি আর সে-সব ফিরে পাবে?

তিন নম্বর গম্ভীরভাবে বললে, সে আমি ভেবেছি কিন্তু এদের অমতে আমার পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। দলের সব গুলোকেই ধ্বংস করে ফেলেছ তোমরা। কেবল আমরা তিন জনই আছি। সুতরাং এদের মত নিয়েই চলতে হবে আমায়। বিশেষতঃ সেদিন এরা গিয়ে না পড়লে ওখানেই আমার শেষ হয়ে যেতো। সমস্ত পথটা এরা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছে।

নিশীথ সায় দিয়ে বললে, সে ঠিক। এদের মত ছাড়া

কিছু করা সঙ্গত হবে না। তবে এদের মত না হবার কোন কারণ দেখিনে। তুমি একটু ভাল করে বুঝিয়ে বললেই হয়।

তিন নম্বর অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললে, এদের মোটেই চেনোনা তুমি, তাই এ কথা বলতে পারলে। এরা তোমাদের রক্ত নেবার জন্য লোলুপ হয়ে রয়েছে। আমার উপর অত্যন্ত চটে গেছে সীতেশবাবুকে চিকিৎসা করার জন্য। এরা তোমাকে সেদিনই সাবাড় করতে চেয়েছিল। অনেক কষ্টে এদের বুঝিয়ে রাখতে হয়েছে। সত্যিই সর্দ্দারকে যারা মেরে ফেলেছে তাদের যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা আমরা করবো।

তার চক্ষুদ্বয় আবার লাল হয়ে উঠলো। সীতেশবাবু উৎকণ্ঠিতচিত্তে নিশীথের দিকে চেয়ে রইলেন। নিশীথ ভড়কে গেল। অনেকটা পথ এগিয়ে এসে হঠাৎ পথের সামনে খাদ দেখলে পথিকের যেমন অবস্থা হয়, এমনি একটা ভাব তার মনে দেখা দিল।

তিন নম্বর একটু পরে আবার শান্ত হয়ে বললে, আচ্ছা প্রস্তাবটা ওদের বলে দেখি। ওরা রাজী কি না? তবে বখরা আমি দুআনার বেশী এক পয়সা দেব না, এ আমি আগেই বলে রাখছি।

নিশীথ চুপ করে রইল। তাকে মৌন দেখে তিন নম্বর বলে উঠল, এতে কি তোমাদের কম লাভ হবে? সমস্ত ঝক্কি

পোয়াতে হবে আমাদের, আর তোমরা শুধু বসে বসে তৈরী করেই খালাস।

নিশীথ এ কথার কোন উত্তর দিল না। তিন নম্বরের আহ্বানে লোক দুটো ঘরে এসে পড়ল। নানা ভণিতা করে লোক দুটোকে প্রস্তাবটা সে জানিয়ে দিলে।

দুজনে কিছুক্ষণ নীরব রইলে। তারপর—

জোয়ান লোকটা অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে বললে, এই বুঝি মতলব আঁটছ তলে তলে। এ আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে এরা। সর্দ্দারকে পর্য্যন্ত মেরে ফেলেছে। দলের কর্ত্তাকে রেহাই দেয়নি, আর তুমি তাদেরই সঙ্গে ব্যবসা চালাতে চাও? এই জন্যেই বুঝি চিকিৎসা চালাচ্ছ পুরোদমে। বিশ্বাসঘাতকতা করলে তোমাকেও আমরা রেহাই দেবো না, তিন নম্বর।

উত্তরের কোন অপেক্ষা না করে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই দুগাছা দড়ি নিয়ে এসে বললে, শয়তান দুটোকে খুব শক্ত করে বাঁধতে হ'বে। এ দুটো পালাবার ফন্দি করেছে। আজই এ দুটোকে শেষ করতে হবে।

বেঁটে লোকটাও এসে দেখা দিল সেই সময়ে। দুজনে মিলে নিশীথ আর সীতেশবাবুকে শক্ত করে বেঁধে ফেললে। নিশীথ বাধা দেবার সুযোগ পর্য্যন্ত পেলে না। আর বাধা দিয়েই বা লাভ কি?

ধাক্কা দিয়ে খাটিয়ার উপর ফেলে দিয়ে জোয়ান লোকটা বিকট স্বরে বলে উঠল, এখন এখানেই শুয়ে থাক। একটু পরেই ভাল করে শোবার ব্যবস্থা করা যাবে। রাত কাটাবার স্থযোগ আর পাবে না। বুনো জানোয়ারের ভোজের ব্যবস্থা হবে তোমাদের দিয়ে। তাদের পেটে গিয়ে দিব্যি আরামে শুয়ে থাকবি, শীত আর লাগবে না।

নিজের রসিকতায় নিজেই সে হো হো করে হাসতে লাগল। সে পৈশাচিক হাসির কি বীভৎস রূপ! হিংস্র ক্রূরতা সেই হাসি ভেদ করে ফুটে বের হচ্ছিল। নিশীথের মন ঘৃণা ও ভয়ে ভরে গেল। সে মুখ ফিরিয়ে নিল। জোয়ান লোকটা বললে, তোমাকে আবার আমি সাবধান করে দিচ্ছি তিন নম্বর, এদের কথার জালে তুমি ভুলো না। সর্দ্দারকে ধ্বংস করেছে যারা, তাদের সঙ্গে আপোষ হতে পারে না। মনে করে দেখ সেদিন তুমি সর্দ্দারের নামে শপথ করেছ। এখন টাকার লোভে এদের ফাঁদে পা দিলে আমাদের কাছে রেহাই পাবে না। গোপন মতলব ছাড়ো তুমি। নইলে—

তিন নম্বর খানিকটা পেছিয়ে গেল। তারপর মাথা দুলিয়ে বললে, সে ঠিক। আর এ দুটোও শেষ পর্য্যন্ত আমারই বিরুদ্ধে লেগে যাবে হয়তো। তোমরা যা ঠিক কর তাই হবে।

লোক দুটো সকলের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে চলে গেল। বুনো জানোয়ারের মত সে দৃষ্টি যেন জ্বল্‌তে লাগল।

পাশবিকতার নিম্নস্তরে নামতে যে এরা কুণ্ঠিত হবে না, সকলে তা বুঝতে পারলে।

তিন নম্বর হাসতে লাগল। অত্যন্ত ক্রুর সে হাসি। তার রুক্ষ প্রকৃতি যেন আবার ফুটে উঠেছে। মুখ চোখ আবার জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। নিশীথের মনে হল, এমনি মুখের আকৃতিই দেখেছিল সে, সেদিন নির্ম্মমভাবে কষাঘাত করবার সময়। সীতেশবাবুর পরিকল্পনা সব ব্যর্থ হবে সন্দেহ নেই।

কর্কশকণ্ঠে সে বলল, তোদের মতলব আমি বুঝেছি, কিন্তু সে হাসিল হবে না কখনো। আজই টুকরো টুকরো করে কেটে পাহাড়ের কোলে তোদের ফেলে দিয়ে আসতে হবে। কাল কোন চিহ্নই থাকবে না তোদের ; বন্য জন্তু এসে নিঃশেষ করে ফেলবে।

খল খল করে হেসে উঠে, তেমনি ক্রুরতার সঙ্গে বললে সে, আমাদের আস্তানা উড়িয়ে দিয়েছিস ডিনামাইট দিয়ে? এর পরিণাম যে কি তা ভেবে দেখিস্ নি, এখনই সেটা ভাল করে বুঝবি।

নিশীথের আর সহ্য হল না। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে সে বলল, আমাদের হাত পা বেঁধে রেখে ইতরের মত কথা বলছ তিন নম্বর। নইলে দেখতুম আমি বুলডগের দাঁতের কত জোর। আঁচিলটা কেটে ফেলবার সময় ঐ দাঁতগুলো যদি ভেঙে ফেলতে পারতে!

তিন নম্বর ক্ষেপে গেল, একটা চাবুক নিয়ে এসে বললে, সেদিনের মত তোর গায়ের চামড়া তুলে ফেলব। এতবড় স্পর্দ্ধা হয়েছে তোর।

চাবুক নিয়ে এগিয়ে এলো সে। নিশীথ ক্রুদ্ধ হয়ে চুপ করে রইল। তিন নম্বর চাবুক তুলে ধরে সজোরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, এমন সময়—

পিছন থেকে কে যেন গর্জ্জন করে উঠল, হাত তোল মাথার উপর। নিশীথ সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখল, নির্ম্মলদা রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিন নম্বরকে লক্ষ্য করে। তাঁর পিছনে নিখিল। হাতে তার মস্ত একটা ছোরা চক চক করছে। নিশীথ অস্ফুট চীৎকার করে বললে, "নির্ম্মলদা! নিখিল!"

তিন নম্বর ভয়ে পেছিয়ে গেল। হাত থেকে চাবুক তার পড়ে গেল। ভয়ে সে পিছু হটতে সুরু করে দিল। নির্ম্মলবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আর পিছিয়ো না শয়তান! নড়লেই গুলি চালাব।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিন নম্বর হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। নির্ম্মলবাবু বলে উঠলেন ভয় নেই নিশীথ। এই শয়তানটার ব্যবস্থা করে নিই আগে।

কিন্তু ব্যবস্থা আর করা হলো না। পাশ থেকে কে যেন তার রিভলভার শুদ্ধ হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা বসিয়ে দিল। রিভলভার ছিটকে পড়লো ঘরের এক পাশে। নিখিল ছোরা

নিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পিছন থেকে কে তার ছোরা সুদ্ধ হাত মুচড়ে ছোরাটা ফেলে দিল। নিখিল তা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল, বেঁটে লোকটা তাকে জাপটে ধরল। দুজনে ধস্তাধস্তি সুরু হল। এই অবসরে তিন নম্বর কুড়িয়ে নিলে রিভলভারটা। কর্কশকণ্ঠে সে বললে, থাম তোমরা, নইলে আমি গুলি করব।

ব্যাপার দেখে নির্ম্মলবাবু হতভম্ব হলেন। জোয়ান লোকটা মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাদের দুজনকে বেঁধে ফেলল। তারপর নির্ম্মমভাবে ধাক্কা দিয়ে মেঝেয় ফেলে দিয়ে বললে, এ দুটো এসে জুটল কোত্থেকে। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখোনি চাঁদ—

অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল সে। আঁচিলওয়ালা এগিয়ে এসে জেরা শুরু করল, কিন্তু নির্ম্মলবাবু বা নিখিল কোন কথার উত্তর দিল না। জোয়ান লোকটা কর্কশকণ্ঠে বলে উঠল, ওদের কথার জন্য সাধাসাধি করতে হবে না তিন নম্বর। কথা যাতে চিরদিনের জন্য খতম হয়ে যায় তারই একটা ব্যবস্থা এখনই হয়ে যাবে। দেরী করে আর লাভ নেই। চল একটু টেনে নেওয়া যাক। তার পর খাদের ধারে নিয়ে সব কটারই ব্যবস্থা করতে হবে আজ।

একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জোয়ান লোকটা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওরা দুজনেও তার পেছন নিল। সশব্দে

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নিশীথ শুনতে পেল, বাইরে থেকে তারা দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে দিলে।

নিশীথ আর্ত্তস্বরে বললে, নিখিল তোমরা এখানে এলে কেমন করে, আর সন্ধানই বা পেলে কি করে ?

নিখিল উত্তর দিল, তোমাদেরই খোঁজে বেরিয়েছিলুম আমরা। বৃষ্টির জন্য আটকা পড়ে যাই এখানে। বরফগলা পথে কোন গাইড পাওয়া গেল না, আর তা ছাড়া এদের পাহাড়ের মধ্যের আড্ডাটা কোথায় কেউ তা বলতে পারলে না। অনেক চেষ্টার পর এই আড্ডার সন্ধান পাওয়া গেল। ভাবলুম এখানেই তোমাদের সন্ধান পাওয়া যাবে। পাওয়া গেল বটে, কিন্তু এমনি ধারা উল্টো ফল হবে তা আমরা ভাবিনি। কতদিন এখানে আছ নিশীথ, এরা আমাদের ছেড়ে দেবে কবে ?

নিশীথ একটু ম্লান হেসে বললে, আজই এরা আমাদের শেষ করে দেবে নিখিল। এখনি এদের হাত থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। অন্য সব কথা পরে শুনো, তোমরা সব বাঁধনটা খুলে ফেলার চেষ্টা করো।

নির্ম্মলবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, আমার হাতের কব্জিটাই ভেঙে দিয়েছে নিশীথ। হাতটা নাড়াচাড়া করতে পারছি নে, বাঁধন খুলে ফেলি কি করে! আর এরা আমাদের এমনি ভাবে বেঁধেছে যেন মাল প্যাক্ করছে। এখন এদের হাত থেকে রক্ষা পাই কি করে ভেবে পাচ্ছিনে।

নিশীথ প্রাণপণে বাঁধন খুলতে চেষ্টা করলে। কিন্তু এমনি ভাবে বাঁধন গায়ে বসে গিয়েছে যে শত চেষ্টা করেও তার কিছুই করতে পারলে না। সীতেশবাবু দীর্ঘকাল গম্ভীর হয়েই ছিলেন। একমনে নিশীথের কার্য্যকলাপ দেখে হতাশ হয়ে বললেন, বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই নিশীথ; আর তাছাড়া বাঁধন খুললেও বেরিয়ে যেতে পারা যাবে না। ওরা আমাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে দিয়েছে। অন্য উপায়ের সন্ধান নিতে হবে আমাদের।

নিশীথ বাধা মানল না। বাঁধন খুলতে সে সবরকম চেষ্টাই করতে লাগল। প্রবল বাঁধনের ফলে তার দেহ অসাড় হয়ে যাচ্ছে, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাঁধনটা খুলতে পারলে নিখিলদের রক্ষার একটা উপায় হতে পারে। কিন্তু সব চেষ্টাই তার ব্যর্থ হয়ে গেল। দড়ির ঘর্ষণে দেহ তার কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে সুরু করে দিল।

হঠাৎ একটা জানলা খুলে গেল। পাশের ঘর থেকে কে যেন তার কার্য্য কলাপ লক্ষ্য করছিল। খল খল করে সে হেসে উঠল। সমস্ত ঘরটা যেন সে পৈশাচিক হাসিতে কেঁপে উঠতে লাগল।

চৌদ্দ

একটা পাহাড়ের পাশে সামান্য এক ফালি সমতল জমি। তার পাশেই খাদ। প্রায় হাজার ফিট নেমে গেছে খাড়া ভাবে। দেখলেই মনে যে কোন নিপুণ শিল্পী একখানা পাথর দিয়ে দেয়ালের মত গেঁথে রেখেছে এখানে। প্রকৃতির এই সৃষ্টি যেমন বিস্ময়কর তেমনি ভীষণ। একবার পা পিছলে খাদের নীচে পড়ে গেলে সব যেন ছাতু হয়ে ছিটকে পড়বে। দূরে অরণ্য ভাগের একটা অংশ এই খাদের পাশ ঘিরে রয়েছে। সে অরণ্যে হিংস্র শ্বাপদ ও কত প্রকারের জন্তু বাস করে তার ইয়ত্তা নেই। সুন্দরের সঙ্গে ভয়ঙ্করের সংমিশ্রণে মনে গভীর রেখা পাত করে।

নিশীথদের সবাইকে আনা হয়েছে এখানে অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে টেনে হেঁচড়ে বন্দী বন্য পশুর চেয়েও হীন অবস্থায়। কেউ তাদের পায়ের বাঁধনটাও খুলে দেবার আবশ্যকতা অনুভব করেনি। পাহাড়ের কঠিন ঘর্ষণে সর্ব্বাঙ্গ তাদের ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। তাদের দুর্দ্দশা দেখে পশুর মতই উল্লাসে মেতে উঠেছে এই তিনটী নরপশু। রাগে ক্ষোভে ওদের সবার চোখেই জল এলো। শুধু সীতেশবাবু নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। বিপদের এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি যেন পাথরের মত হয়ে গিয়েছিলেন। কী যেন একটা গভীর চিন্তা তাঁর সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

নিশীথ চেয়ে দেখলে, মদের প্রভাবে এরা এখন পশুর চেয়েও হীন হয়ে পড়েছে। চোখ দুটো তাদের হয়েছে জবা ফুলের মত লাল। তিন নম্বর দাঁড়িয়ে রয়েছে রিভলভার হাতে করে। জোয়ান লোকটা একটা বৃহৎ ছোরা নিয়ে তার ধার পরীক্ষা করছে। বেঁটে লোকটার হাতেও একটা ছোরা চক্-চক্ করে উঠছে। যে কোন মুহূর্ত্তেই এরা হিংস্র পশুর মত লাফিয়ে পড়তে পারে। নিশীথ সভয়ে চোখ বুঁজে ফেলল।

সীতেশবাবু হঠাৎ অতি কষ্টে পাশ ফিরে নিশীথকে বললেন, মনের বল হারিয়ো না নিশীথ। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। তোমার দুর্ব্বলতা কোন রকমে যেন প্রকাশ না পায়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখো।

নিশীথ হতাশ হয়ে বললে, আর চেষ্টা! সব চেষ্টার বাইরে এসে পড়েছি সীতেশবাবু। এদের হাতে এখনই শেষ হতে হবে আমাদের সকলকে।

নির্ম্মলবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন, আর এ যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছেনা। ভাঙ্গা হাতটা এরা নির্ম্মম ভাবে বেঁধেছে, হাতটা যেন বসে গেল আমার। এর চেয়ে শেষ হলেই বাঁচি।

জোয়ান লোকটা কর্কশ কণ্ঠে বললে, ঘেউ ঘেউ করা এখন তোরা বন্ধ কর দেখি। যা কিছু বলবার বুনো জন্তুর পেটে গিয়ে বলিস। ঐ খাদটার নীচে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেবো তোদের।

গভীর খাদটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে খল খল করে একটা পৈশাচিক হাসি হাসল সে। সমস্ত পাহাড়টায় প্রতিধ্বনিত হল তার সেই অস্বাভাবিক অট্টহাসি।

মদের বোতল খুলে বসল তারা। নিশীথের মনে হল একবার অত্যধিক মদের প্রভাবে এরা যদি অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে হয়ত মুক্তির একটা সন্ধান মিলতে পারে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল সে আশা। টলতে টলতে জোয়ান লোকটা এগিয়ে এলো, সীতেশবাবুকে ধরে হেঁচড়ে নিয়ে খাদের পারে রেখে বললে, এই পালের গোদাটাকেই আগে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে। সর্দ্দারকে মেরে ফেলেছে এরা, দলটার প্রায় সবাইকে দিয়েছে শেষ করে। মাটিতে পুঁতে কুকুর দিয়ে এদের খাওয়ালেও রাগ যাবে না আমার।

ছোরাটার ধার পরীক্ষা করতে লাগল সে। একটা অস্ফুট চীৎকার করে অত্যন্ত আর্ত্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রইল নিশীথ। অত্যন্ত দুর্যোগ আর বিপত্তির মধ্যে সে সীতেশবাবুকে রক্ষা করে আনতে পেরেছে, কিন্তু আজ সব আশা শেষ হয়ে গেল।

সীতেশবাবু চীৎকার করে ডেকে উঠলেন, তিন নম্বর!—ডিসুজা—

চমকে উঠলো তিন নম্বর। মদের নেশা যেন তার ছুটে গেল। ক্ষিপ্রগতিতে উঠে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সীতেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে. আমার নাম তুমি জানলে কি করে?

সীতেশবাবু অট্টহাস্য করে বললেন. এখনই আমাদের সব শেষ করে দেবে ভেবেছ, তাই যাবার আগে তোমাকে দুটো কথা বলতে চাই। শুধু তোমার নাম জানিনে ডিসুজা, তুমি যে ফেরারী আসামী! খাঁড়া ঝুলছে তোমার মাথার উপর, এও জান্‌তে আমার বাকী নেই।

তিন নম্বর ব্যঙ্গের সুরে বললে তাতে হয়েছে কি? তোমার তো এখনই শেষ হয়ে যাবে।

সীতেশবাবু আবার হেসে উঠলেন, সর্দ্দার আমার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল কেন জান? তিন নম্বর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু কোন কথা বললে না।

সীতেশবাবু বলে চললেন, শোন্ তবে ডিসুজা, তোমাদের চীনাম্যান সর্দ্দার যা বলেছে ঃ

তিন নম্বরের সামনে যেন বোমা পড়ল। অত্যন্ত ভীত হয়ে সে বললে, সর্দ্দারের পরিচয় তুমি জানলে কি করে?

সীতেশবাবু তার কথার কোন উত্তর না দিলেন না। জোয়ান ও বেঁটে লোকটা অত্যন্ত তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তাঁর উপর।

তিন নম্বর একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, বলতেই হবে তোমায় সব কথা।

সীতেশবাবু বলতে লাগলেন, নিশীথের প্রস্তাবটা মন্দ ছিল না। কিন্তু আমি ভেবে দেখলুম এর কোন প্রয়োজনই নেই। আমাদের হাতে যা আছে যথেষ্ট।

তিন নম্বর অধীর হয়ে বলল, বলে ফেল সে কথা, নইলে আমরা দেখে নেব কেমন করে কথা আদায় করতে হয়।

সীতেশবাবু হাসতে লাগলেন। এই বিপদের মুখে সীতেশ-বাবুর এই অস্বাভাবিক হাসি দেখে নিশীথের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। একটা ক্ষীণ আশাও তার মনে উঁকি দিতে লাগল। সীতেশবাবুর এই হেঁয়ালির ভেতর দিয়ে যদি মুক্তির কোন উপায় দেখা দেয়!

সীতেশবাবু একটু পরে বললেন, অনর্থক সে-সব কথা জেনে আর লাভ কি ডিসুজা, তার চেয়ে মেরে ফেলবার সব ব্যবস্থাই করে ফেল। আমায় ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই।

তিন নম্বর জেদ ধরলে—না, বলতেই হবে সব কথা।

সীতেশবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, সর্দ্দার আমার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কেন দিয়েছিল তা জান?

তিন নম্বর মাথা নেড়ে বললে, না—সর্দ্দার আমাদের কিছু বলেন নি।

সীতেশবাবু বলে চললেন, তার কারণ সর্দ্দার আমাকে তার ধনরত্নের কথা সব বলে দিয়েছিলেন, হঠাৎ তার মৃত্যু হলে কোথায় কি ভাবে সে ধন রত্ন পাওয়া যাবে, আর তা দিয়ে কি করতে হবে এটাও তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই কি যেন একটা সন্দেহের ভাব আসে আমার উপর। তাই এই মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা। জাল নোটের ব্যাপার একটা ছলনা মাত্র।

তিন নম্বর যেন একটু মুষড়ে পড়ল। সন্দেহ করে সে বলল, তোমার কথা যে সত্য, তার প্রমাণ ?

সীতেশবাবু হেসে উঠলেন, সর্দ্দারের পরিচয়ই এর পক্ষে যথেষ্ট। বিশ্বাস না কর, তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পার। আমি বিন্দুমাত্র বাধা দিইনে তোমাদের এই মেরে ফেলবার আগ্রহ দেখে—

তিন নম্বর একটু ঝুঁকে পড়ে বললে, সেই ধনরত্ন কোথায় আছে বলে দিতে হবে তোমায়। আমরা সেটা উদ্ধার করে আনব।

সীতেশবাবু উচ্চ হাস্য করে বললেন, আমাকে তোমরা এমনি বোকা ঠাউরেছ যে আমি তার কথা প্রকাশ করে দিই। আর তোমরা সেটা নিয়ে সরে পড়।

তিন নম্বর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, না বললে সাঁড়াশী দিয়ে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব তোমার।

সীতেশবাবু ধমকের সুরে বললেন, সাবধান হয়ে কথা বলো ডিসুজা। ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করবে এমন লোক আমাকে পাওনি তুমি। দুর্ব্বল শরীর আমার। সামান্য অত্যাচারেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে আমার দেহ থেকে। সুতরাং কথা বের করে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে ;—অত্যাচার যতই করো তোমরা। যাও আমাকে বিরক্ত করো না ; তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার।

তিনজনে দূরে গিয়ে কি যেন পরামর্শ করল। তারপর তিন নম্বর এগিয়ে এসে বললে, কোথায় টাকা পয়সা আছে বলে দাও, তোমাকেও একটা অংশ দেব আমরা।

সীতেশবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, সেটা আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। অনেক সাঙ্কেতিক ব্যাপার রয়েছে এর ভেতর। আমাকে অর্দ্ধেকটা দিতে হবে তোমাদের।

তিন নম্বর একটু ভেবে বললে, তাই হবে।

সীতেশবাবু বললেন, তা হলে আমাদের বাঁধন সব খুলে দাও, চল সব আমার সঙ্গে, টাকা পয়সা বের করে ভাগাভাগি করে সরে পড়ব আমরা। সেই টাকা পয়সা নিয়ে তোমাদের যা ইচ্ছে করো। আমরা সে দিকে মাথা গলাব না। কেমন, এতে রাজী আছ তোমরা?

তিন নম্বর ভাবতে সুরু করে দিল। নিশীথ অবাক হয়ে গেল সীতেশবাবুর এই সব কথা শুনে। কই সীতেশবাবু ঘুণাক্ষরেও এ কথা তার কাছে প্রকাশ করেন নি তো। তবে কি সীতেশবাবু একাই এই সব ধনরত্ন ভোগ করতে চেয়েছিলেন? মনের মধ্যে কেমন যেন সন্দেহের একটা ভাব তার দেখা দিল।

জোয়ান লোকটা এই সময়, কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, ওসব ছেঁদো কথায় ভুলবার লোক নই আমরা। ইচ্ছা হয় এখনই বলে দাও টাকা পয়সা সব কোথায় লুকানো রয়েছে, নইলে দেখতে পাচ্ছ—

ছোরাখানা শূন্যে একবার ঘুরিয়ে নিলে সে। চক্‌চক্ করে উঠলো সেটা। সীতেশবাবু একটা ঘৃণার ভাব দেখিয়ে মুখ ফেরালেন। জোয়ান লোকটা তার বুকের উপর চেপে বসল। চীৎকার করে বললে,—বলবে না ?

সীতেশবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, না।

জোয়ান লোকটা ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে উঠল। হায়নার মত তীক্ষ্ণ হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে। ছোরাখানা বুকে বসিয়ে দেবার জন্য যে তুলে ধরল।

হঠাৎ পিছন থেকে কর্কশ কণ্ঠে তিন নম্বর বলে উঠল থাম। ছোরাখানা তেমনি ভাবে রেখেই জোয়ান লোকটা মুখ ফেরালে। তিন নম্বর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আজ এ সব বন্ধ রাখতে হবে আমাদের। সর্দ্দার নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা রেখে গিয়েছে। এই লোকটার সাহায্যে আমরা সেগুলো বের করবো।

জোয়ান লোকটা ছোরা নামিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, তোমার কোন কথাই আমি শুনছিনে তিন নম্বর। এগুলোকে আজই সাবাড় করব আমি। সর্দ্দারকে মেরে ফেলার শোধ নিতেই হবে। এতে বাধা দিতে এলে তোমাকেও ঐ খাদের তলায় যেতে হবে।

তিন নম্বর রিভলভার উঠিয়ে চীৎকার করে বললে, বন্ধ রাখতেই হবে এসব। জোয়ান লোকটা ভ্রূক্ষেপ না করে আবার ছোরা তুলে ধরল।

হঠাৎ পর পর গুলির শব্দে সচকিত হয়ে উঠল সে স্থান। নিশীথ চমকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলে, গুলির আঘাতে জোয়ান লোকটা পড়ে ছটফট করতে করতে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বেঁটে লোকটা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে তিন নম্বরের উপর। হাত ভুমড়ে রিভলভারটা ফেলে দিয়েছে সে তিন নম্বরের হাত থেকে। খাদের পাশে তা পড়ে রয়েছে। দুজনেই রিভলভারটা কুড়িয়ে নেবার জন্য ধস্তাধস্তি সুরু করে দিয়েছে। বেঁটে লোকটার হাতে আর ছোরাটাও নাই। সম্ভবতঃ খাদের নীচেই গিয়ে পড়ে থাকবে।

সবারই হাত পা এমনি ভাবে বাঁধা রয়েছে যে, নড়াচড়া করবারও উপায় নেই। নিশীথ অতি কষ্টে গড়িয়ে গড়িয়ে এগোতে লাগল খাদের পাশে। যদি এই সুযোগে রিভলভারটা কুড়িয়ে নিতে পারে। সীতেশবাবু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন এই মল্লযুদ্ধের দিকে। ততক্ষণে তিন নম্বর বেঁটে লোকটাকে অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছে। সীতেশবাবু চীৎকার করে বললেন, ওটাকে খাদের মধ্যে ফেলে দাও ডিসুজা, তা হলে আমরা নিষ্কণ্টক হবো।

বেঁটে লোকটার কানে এই কথা যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে আবার সে জড়িয়ে ধরলে তিন নম্বরকে। একেবারে খাদের পাশে এসেছিল তারা। বেঁটে লোকটা প্রাণপণে গলা চেপে ধরেছে তিন নম্বরের। রুদ্ধ শ্বাস থেকে রক্ষা

পাবার চেষ্টায় তিন নম্বর তাকে প্রাণপণে খাদের পাশে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল। বেঁটে লোকটা যেন মরিয়া হয়ে উঠল। অর্থলোভে দলভ্রষ্ট হয়েছে তিন নম্বর। সুযোগ পেলেই সে তাকে ছিঁড়ে ফেল্‌বে, জোয়ান লোকটার শোচনীয় পরিণাম দেখে বেঁটে লোকটা তা ভাল ভাবেই বুঝতে পারল, শ্বাসরুদ্ধ করবার কোন চেষ্টারই ত্রুটী করল না সে। নিশীথও সুযোগ বুঝে ধীরে ধীরে রিভলভারটার পাশে গড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল।

তিন নম্বরের চোখ দুটো ক্রমশঃ যেন কপালফুটে বেরোতে চাইল। মরণোন্মুখ অবস্থায় সে একবার রিভলভারটার দিকে হাত বাড়াল। সেটা তুলে নেবার উপক্রম করতেই বেঁটে লোকটা তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ কর্‌ল। দুজনার কেউ সে বেগ রোধ কর্‌তে পারল না। বেঁটে লোকটা খাদের নীচে সহসা পড়ে গেল। সঙ্গে সে তিন নম্বরকেও টেনে নিয়ে চল্‌ল। একটা তীব্র আর্ত্তনাদের সুর বাতাসে ভেসে উঠে সহসা থেমে গেল। সকলে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল সে দিকে।

নিখিল গড়িয়ে এসে জোয়ান লোকটার পরিত্যক্ত ছোরাটা কুড়িয়ে এনে অতিকষ্টে নিশীথের দেহের বাঁধন কেটে দিল। সবাই ক্রমশঃ বন্ধনমুক্ত হয়ে উঠলেন। দীর্ঘকালের বন্ধনে সকলের দেহেই কেমন যেন একটা অসারতার ভাব দেখা দিয়েছিল।

সবাই এসে আবার খাদের পাশে দাঁড়ালেন, নীচে অস্পষ্ট ভাবে নিশ্চল দেহ দুটো দেখা যাচ্ছিল। বনান্তরাল ভেদ করে হিংস্র পশুর দলকে বুভুক্ষার প্রেরণায় সেই দেহ দুটোর দিকে ছুটে চল্‌তে দেখা গেল। কয়েক নিমেষ মাত্র লাগবে তাদের ঐ দেহ দুটোর শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করতে। নিশীথ নির্নিমেষ নয়নে সেদিকে চেয়ে রইল।

সীতেশবাবু একটু হেসে বল্‌লেন, এদের সমাপ্তি এমনি-ভাবেই হয়ে থাকে, নিশীথ। এতে আর ক্ষোভ করে লাভ নেই।

জোয়ান লোকটার নিশ্চল দেহটার দিকে নির্দ্দেশ করে আবার বল্‌লেন তিনি, এটাকে আর এখানে রেখে লাভ কি? সারাজীবন ধরে যথেষ্ট পাপ করেছে এ, দেহটা তাই নীচেই ফেলে দেওয়া যাক্। এতে হয়ত কতকগুলো জীবের ভক্ষ্য হয়ে পাপের ভারটা কিছু লাঘব হবে।

সবাই মিলে সেটাকে খাদের নীচে ফেলে দিলেন। হাজার ফিট্ নীচু হতে নরভুক হিংস্র স্বাপদের উল্লাস ধ্বনি তখন ভেসে আস্‌ছিল।

বর্ষামেঘের কবল থেকে মুক্ত হয়ে দেখা দিল জ্যোৎস্নার প্লাবন। বরফঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় তা প্রতিফলিত হয়ে প্রকৃতির এক অপরূপ রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে যেন পড়্‌তে লাগল স্নেহের পরশ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলো পাহাড়ের আনাচে কানাচে উঁকি দিয়ে জ্যোৎস্নার সঙ্গে যেন

খেলে বেড়াতে সুরু করে দিল। প্রকৃতির এই মহিমাময় রূপ দেখে চল্‌তে চল্‌তে নিশীথ বলে উঠল, কি সুন্দর! নিখিল হেসে বল্‌লে, এতো বৈজ্ঞানিকের সাহিত্য প্রীতির পরিচয় দেখছি, বেশ কবিত্ব দেখা দিচ্ছে তোমার।

নিশীথ সহসা নিখিলের দুহাত চেপে ধরে বললে, সত্যি ভাই, আজ তোমারই দিন। আর অন্য কোন কথা নয়। আজ আমার শুধু শুনতে ইচ্ছে করছে তোমার কাব্য গাঁথা। নগাধি-রাজ তাঁর সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন আমাদের সাম্‌নে, তাই আজ শোনাও তোমার কবি মনের সুন্দর অভি-ব্যক্তির কথা।

নিখিল তার এই ভাবান্তরে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। নির্ম্মলবাবু শুধু মিটিমিটী হাস্‌তে লাগলেন।

—শেষ—

—এই লেখকেরই লেখা—

